B3813

প্রিয়াঙ্কী

মৌলানা খাফী খান

ভারত লাইব্রেরী, ১১৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ॥

প্রথম সংস্করণ
১৫ শ্রাবণ, ১৩৬৩

প্রকাশক
সত্যব্রত গুহ
সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
অহিভূষণ মল্লিক

প্রচ্ছদ-মুদ্রক
মোহন প্রেস
১ করিশচার্চ লেন
কলিকাতা—৯

ব্লক
ষ্ট্যাণ্ডার্ড এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মুদ্রক
শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায়
লোকসেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা—১৪

বাঁধিয়েছেন
আব্দুল হামিদ খান
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

দু'টাকা বার আনা

৩৮-১৩
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
৫. ২. ৬০

মাকে

প্রিয়াংগী

বু

কোরীয়ায় যাইনি।

আমাদের এই ভারতবর্ষেই কোরীয়া নামে একটি রাজ্য ছিল। এখনো জায়গাটিকে কোরীয়াই বলা হয়, তবে তার রাজত্ব ঘুচে গেছে; পাটেলী ব্যবস্থায় ওটি মধ্যপ্রদেশে মিশে গেছে। ছোট হলেও জায়গাটির গুরুত্ব আছে, কারণ ওখানে কয়লা পাওয়া যায়। দৃশ্যও মনোরম। বাঘ আছে, অতএব শিকারীদের আনাগোনাও ঘন ঘনই হয়ে থাকে।

এসব শোনা কথা। এ কোরীয়াও চাক্ষুষ দেখিনি। তবে কোরীয় দেখেছি—কোরীয়া দেশের কোরীয়—বু।

বুঝিয়ে বলছি।

১৯৪২ সাল। যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা ক্রমশ নোয়াখালির দিকে এগিয়ে আসছে। চার্চিল রুষ্ট, ওয়েভেল উদ্বিগ্ন, আমাদের ইউনিটের বেঁটেখাটো মেজর সায়েবের মুখখানাও বেজার। অবশ্য আমরা জানি, মেজরের ভিতরে হাসি গুড়-গুড় করছে, মস্করা ঠোঁটের ডগা অবধি এসে রুখে রয়েছে, কিন্তু ব্রিগেডীয়ার মশায়ের মুখখানা এত অমাবস্যার মত যে মেজরকেও বিয়োগান্ত নাটকের মুখোস পরে হাসি চাপ্‌তে হচ্ছে।

লড়াইয়ের বড়কর্তারা দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে আসছেন। আরাকান রণভূমি থেকে সেনাপতিদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে দিল্লীতে। ঘন ঘন মন্ত্রণাসভা বস্‌ছে। দিল্লীশ্বরেরা রণক্লান্ত রথীদের মতামত চাইছেন—কী ক'রে জাপানী-দের আটকানো যায়?

একজন মহারথী বললেন, কিছু নয়—পাঁচশ বিমান, কিছু বোমারু, কিছু লড়িয়ে আর খানিক সৈন্যবাহী—

বড়কর্তারা বললেন, "ব্যস্‌, আর বলতে হবে না। বিমান যা পাচ্ছ ওই ঢের। অন্য কিছুতে হয় তো বল।"

'ডন্‌বাইক ফ্রণ্টের জেনারাল বললেন, "আচ্ছা, তা'হলে দিন খানকতক হাল্‌কা ট্যাঙ্ক আর হাজার তিনেক লোক—সব পদাতিক দেবেন না, অন্তত আদ্ধেকের সঙ্গে যেন গাড়ী থাকে—"

দিল্লী বললেন—"ক্ষেপেছ! গাড়ী কোত্থেকে দেব?"

ফ্রণ্টের জেনারাল মনে মনে গজ্‌রাতে লাগলেন, "তাই তো! যত গাড়ী জমা থাক কলকাতা আর দিল্লীতে, বাবুরা হাওয়া খাবেন আর ফূর্তি ক'রে বেড়াবেন। আর আমি ব্যাটা যুদ্ধক্ষেত্রে গাড়ীর অভাবে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াই, হুঁ।"

দিল্লীর জেনারাল স্বগতোক্তি করলেন, "জাপানীরা এগিয়ে এলে তীরবেগে ভেগে পড়বার মতলব! তাই বীর পুরুষদের ফ্রণ্ট-লাইনে অত গাড়ীর দরকার। কাকে হাইকোর্ট দেখাচ্চ বাপু, সব বুঝি! এই ক'রে ক'রে চুল পেকে গেল।"

চাউট ফ্রণ্টের সেনাধ্যক্ষ বললেন, "আমরা বার বার এগিয়ে যাই, কিন্তু রসদ ফুরিয়ে যায় ব'লে বার বার ফিরে আসতে হয়। অন্তত এক কোম্পানী রসদবাহী খচ্চর আমাদের দিন, দেখবেন কী হয়।"

দিল্লী হুমকি দিয়ে বললেন, "এক কোম্পানী খচ্চর দিয়ে আপনি যুদ্ধের ভোল ফিরিয়ে দেবেন? যাক্‌ বোঝা গেছে ব্যাপার, এখন আপনারা অবিলম্বে স্ব স্ব ফ্রণ্টে প্রত্যাবর্তন করুন, আমরা ভেবে দেখি তাল সামলানোর উপায়।"

দিল্লীতে সেনাপতিদের বৈঠক। বিলেত থেকে একজন বিশেষজ্ঞ এসেছেন, তাল সামলাবেন। নতুন পন্থায়।

"আমি যে পথ বাৎলাবো তাতে আপনারা শিউরে উঠবেন, তা আমি জানি। তবে একথাও তো সত্যি—অপ্রিয় হলেও—যে মামুলী পন্থায় আমরা জাপানীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছি না। সময়ে হয়তো পারব। অস্ত্রশস্ত্রের অভাবও হয়তো সময়ে ঘুচবে। কিন্তু সে সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকলে তো চলবে না।"

ঘ

একজন সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যাকে বলছেন 'মামুলী পন্থায় যুদ্ধ' সেটা কি তা'হলে মুলতুবী থাকবে?"

ওস্তাদ বললেন, "না না, মামুলী রকমের যুদ্ধ যেরকম আপনারা চালাচ্ছেন চালিয়ে যান, ওতেই যদ্দূর যা পারেন করুন। আমি যে পথটির কথা বলতে যাচ্ছি সেটা বাড়তি। তবে তাতে আপনাদেরও সুবিধে হবে। চীনে তো হয়েছে।"

সমস্বরে জেনারালেরা চেঁচিয়ে উঠলেন, "চীনে! চীনে তো জাপানীরা বিনাবাধায় এগিয়ে যাচ্ছে। চুংকিং তো যায় যায়!"

সদ্যাগত বললেন, "আমি চুংকিং-এর কথা বলছি না। যেখানকার কথা আমি বলছি সেখানে চুংকিং-এর কোনো সৈন্য নেই। সেখানে জাপানীদের সঙ্গে লড়ছে অষ্টাদশ আর্মি গ্রুপ।"

সত্যিই শিউরে উঠে একজন সেনাপতি বললেন, "কিন্তু তারা তো মাও-সে-তুং-এর দল! আমাদের কি তাদের মত যুদ্ধ করতে হবে—এই আপনার নতুন পথ?"

ওস্তাদ হেসে বললেন, "হাঁ-ও বটে, না-ও বটে। ওদের পদ্ধতি থেকে নেব, মতবাদ থেকে নয়। কী নেব তা বলছি ..."

কলকাতার শহরতলী। গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ বাগানবাড়ী। যুদ্ধের দরুণ ফৌজের দখলে। মামুলী ফৌজ নয়, মাথা মাথা লোক সব এ-বাগানবাড়ীতে জমায়েত, বুদ্ধি খাটিয়ে যুদ্ধের নতুন নতুন ফন্দী বার করছেন।

সব ফন্দী ওৎরায় না।

একবার এক দিক্‌পাল সস্তায় কিস্তির এক কল করেছিলেন। যুদ্ধ হচ্ছিল আরাকানে—নাফ্ নদীর ধারে। মিত্রপক্ষের ঘাঁটি ছিল নদীর উজানে, জাপানীদের ঘাঁটি ভাঁটির দিকে। খবর পাওয়া গেল জাপানীরা মেলা সাম্পান্ জড়ো করছে, সম্ভবত নদী বেয়ে উজিয়ে এসে মিত্রপক্ষের উপর হানা দেবে। খবর পেয়েই দিক্‌পাল সুকুঞ্চিত মগজে আরো দু' প্যাঁচ কষে মতলব দিলেন—আজই ভাঁটার সময়, সন্ধ্যার

অন্ধকারে, কয়েক ডজন 'মাইন' নদীতে ছেড়ে দাও! ভাসতে ভাসতে গিয়ে সেগুলো জাপানী সাম্পান্‌বহরে লাগবে—নিখরচায় সমূহ বিনাশ হয়ে যাবে।

সেইমত করা হ'ল। মাইনগুলো ভাঁটার টানে দুল্‌তে দুল্‌তে ভাসতে ভাসতে রওনা হ'ল জাপানী বহরের দিকে। দিকপালের দল ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইল কান পেতে—লক্ষ্যভেদের অপেক্ষায়। মিনিট কয়েক বাদেই একটা শব্দ শোনা গেল, কিন্তু সেটা মাইন ফাট্‌বার শব্দ নয়, দূরে কিসের যেন একটা কোলাহল। ক্রমেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল; মনে হ'ল কোলাহলটা যেন নদীপথে দিক্‌-পালের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দিক্‌পাল হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, "উত্তম, জাপানীরা জলপথে আক্রমণ শুরু করেছে। আমাদের মাইন চলেছে ভাঁটার স্রোতে, ওরা আসছে উজিয়ে। ধাক্কাটা লাগবে ঠিক মাঝপথে।"

কিন্তু ও কি? ও শব্দ তো শত্রুসৈন্যের কোলাহল নয়, ও যে জলকল্লোল! ব্যাপার কী ভালো ক'রে বুঝতে না বুঝতেই হতভম্ব দিক্‌পালের দলের সুমুখ দিয়ে বিরাট অট্টহাসের মত চলে গেল জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের একটা লহর!

এইবারে মাইন ফাটার পিলে-চম্‌কানী আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো—ভাঁটিতে নয়, উজানে। প্রথমে ফেটে চৌচির হ'ল একটা জেটি, যেখানে মিত্রপক্ষের রসদবাহী নৌকাগুলো এসে লাগে। দুখানা নৌকো জেটিতে বাঁধা ছিল, সে দুটিও গেল। তারপর মাইনগুলো গিয়ে লাগল একটি শক্তপোক্ত কাঠের ব্রিজে, যার উপর দিয়ে মিত্র-পক্ষের রসদবাহী খচ্চরগুলো আসত। (নৌকোয় খচ্চর পারাপার করা যে কী ঝকমারি তা প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না ও-জানোয়ার-টির নাম খচ্চর কেন রাখা হয়েছে।)

প্রথম মাইনের ধাক্কায় ব্রিজখানা একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়খানাতে ব্রিজ সবশুদ্ধ হুড়মুড় ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর মাইনগুলো চল্‌ল আরও উত্তরে, মিত্রপক্ষের আড্ডার আরো গভীরে। সেখানে যে কী লঙ্কাকাণ্ড ঘট্‌ল তার খবর নেবার আগেই—

জোয়ারের সুযোগে কুড়িখানা নৌকো ক্ষিপ্রবেগে এসে লাগ্‌ল

ঠিক সেইখানে যেখানে এই খানিক আগে দিক্‌পাল জাপানীবহর ধ্বংস করবার জন্য মাইন ছেড়েছিলেন—ভাটার অন্তিম মুহূর্তে। নৌকো থেকে নামল তিন কোম্পানী জাপানী সৈন্য।

অবশ্য জাপানীরা যখন নামল, তখন সেখানে দিক্‌পালের চিহ্নমাত্র নেই। তখন তিনি ছুটছেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, তীরবেগে, সাঙ্গোপাঙ্গদের বহু পিছনে রেখে। সেই ছুটের মোমেণ্টামে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন কক্সবাজার-চট্টগ্রাম-কুমিল্লা এবং তারপর প্লেনে চড়ে কলকাতা-দিল্লী-লণ্ডন।

সব ফন্দিরই যে এই দশা হয় তা নয়, দুটো একটা লেগেও যায়। তাছাড়া, তখন যুদ্ধের যা অবস্থা তাতে কুটোটিকেও হাত-ছাড়া করা যায় না। অতএব বিলেত থেকে সদ্যাগত ধনুর্ধর গোপনে যে ফন্দিটা বাৎলালেন, তাতে কোনরূপ বাগড়া না দিয়ে সমরনেতারা সেটাকে কাজে লাগানোই স্থির ক'রে ফেললেন। গঙ্গাতীরের বাগানবাড়িতে তোড়জোড় শুরু হ'ল।

ফন্দির সূত্রটা অতি সূক্ষ্ম। জাপানীদের দম্ভে ঘা দিতে হবে। ধড়াধ্বড় ক'রে ইন্দোচীন, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা দখল ক'রে নেওয়াতে ওদের আত্মপ্রত্যয়টা অসম্ভব বেড়ে গেছে। যত ওরা এগোচ্ছে, জিনিসটা ততই বাড়ছে; ওদের হারানোও ততই শক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। অতএব অচিরে ওদের আত্মপ্রত্যয়ে ঘা দিতে আরম্ভ না করলে ওদের হারানো অসাধ্য হয়ে উঠবে। এই সূত্র।

ঘা'টি কীরূপে দিতে হবে?

পাঁচশো বিমান হাতে থাকলে বোমা দিয়ে ঘা দেওয়া যেত। কিন্তু তা নেই। লাঠি থাক্‌লে লাঠ্যৌষধি প্রশস্ত, কিন্তু না থাকলে? না থাকলে অন্যভাবে ঘা দিতে হবে—যেমন মহাভারতে দ্রোণকে দেওয়া হয়েছিল যুধিষ্ঠির মারফৎ অশ্বত্থামার মিতা গজের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে।

ধরো, জাপানের দুর্ধর্ষ বন্ধু জার্মানি, জাপানেরই তুল্য 'অজেয়' —তারা যে রুশ রণভূমে নাকানি চোবানি খাচ্ছে সে খবর যদি আরাকান ফ্রণ্টের জাপানী সৈন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তবে কীহয়? জাপানীদের দম্ফাই একটু কমে না? কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের

অন্ধকারে, কয়েক ডজন 'মাইন' নদীতে ছেড়ে দাও! ভাসতে ভাসতে গিয়ে সেগুলো জাপানী সাম্পান্‌বহরে লাগবে—নিখরচায় সমূহ বিনাশ হয়ে যাবে।

সেইমত করা হ'ল। মাইনগুলো ভাঁটার টানে দুল্‌তে দুল্‌তে ভাসতে ভাসতে রওনা হ'ল জাপানী বহরের দিকে। দিকপালের দল ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইল কান পেতে—লক্ষ্যভেদের অপেক্ষায়। মিনিট কয়েক বাদেই একটা শব্দ শোনা গেল, কিন্তু সেটা মাইন ফাট্‌বার শব্দ নয়, দূরে কিসের যেন একটা কোলাহল। ক্রমেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল; মনে হ'ল কোলাহলটা যেন নদীপথে দিক্‌পালের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দিক্‌পাল হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, "উত্তম, জাপানীরা জলপথে আক্রমণ শুরু করেছে। আমাদের মাইন চলেছে ভাঁটার স্রোতে, ওরা আসছে উজিয়ে। ধাক্কাটা লাগবে ঠিক মাঝপথে।"

কিন্তু ও কি? ও শব্দ তো শত্রুসৈন্যের কোলাহল নয়, ও যে জলকল্লোল! ব্যাপার কী ভালো ক'রে বুঝতে না বুঝতেই হতভম্ব দিক্‌পালের দলের সুমুখ দিয়ে বিরাট অট্টহাসের মত চলে গেল জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের একটা লহর!

এইবারে মাইন ফাটার পিলে-চম্‌কানী আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো—ভাঁটিতে নয়, উজানে। প্রথমে ফেটে চৌচির হ'ল একটা জেটি, যেখানে মিত্রপক্ষের রসদবাহী নৌকাগুলো এসে লাগে। দুখানা নৌকো জেটিতে বাঁধা ছিল, সে দুটিও গেল। তারপর মাইনগুলো গিয়ে লাগল একটি শক্তপোক্ত কাঠের ব্রিজে, যার উপর দিয়ে মিত্রপক্ষের রসদবাহী খচ্চরগুলো আসত। (নৌকোয় খচ্চর পারাপার করা যে কী ঝকমারি তা প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না ও-জানোয়ারটির নাম খচ্চর কেন রাখা হয়েছে।)

প্রথম মাইনের ধাক্কায় ব্রিজখানা একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়খানাতে ব্রিজ সবশুদ্ধ হুড়মুড় ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর মাইনগুলো চল্‌ল আরও উত্তরে, মিত্রপক্ষের আড্ডার আরো গভীরে। সেখানে যে কী লঙ্কাকাণ্ড ঘট্‌ল তার খবর নেবার আগেই—

জোয়ারের সুযোগে কুড়িখানা নৌকো ক্ষিপ্রবেগে এসে লাগ্‌ল

॥ ৫ ॥

ঠিক সেইখানে যেখানে এই খানিক আগে দিক্‌পাল জাপানীবহর ধ্বংস করবার জন্য মাইন ছেড়েছিলেন—ভাঁটার অন্তিম মুহূর্তে। নৌকো থেকে নামল তিন কোম্পানী জাপানী সৈন্য।

অবশ্য জাপানীরা যখন নামল, তখন সেখানে দিক্‌পালের চিহ্নমাত্র নেই। তখন তিনি ছুটছেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, তীরবেগে, সাঙ্গোপাঙ্গদের বহু পিছনে রেখে। সেই ছুটের মোমেণ্টামে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন কক্সবাজার-চট্টগ্রাম-কুমিল্লা এবং তারপর প্লেনে চড়ে কলকাতা-দিল্লী-লণ্ডন।

সব ফন্দিরই যে এই দশা হয় তা নয়, দুটো একটা লেগেও যায়। তাছাড়া, তখন যুদ্ধের যা অবস্থা তাতে কুটোটিকেও হাতছাড়া করা যায় না। অতএব বিলেত থেকে সদ্যাগত ধনুর্ধর গোপনে যে ফন্দিটা বাৎলালেন, তাতে কোনরূপ বাগড়া না দিয়ে সমরনেতারা সেটাকে কাজে লাগানোই স্থির ক'রে ফেললেন। গঙ্গাতীরের বাগানবাড়িতে তোড়জোড় শুরু হ'ল।

ফন্দির সূত্রটা অতি সূক্ষ্ম। জাপানীদের দম্ভে ঘা দিতে হবে। ধড়াধ্বড় ক'রে ইন্দোচীন, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা দখল ক'রে নেওয়াতে ওদের আত্মপ্রত্যয়টা অসম্ভব বেড়ে গেছে। যত ওরা এগোচ্ছে, জিনিসটা ততই বাড়ছে; ওদের হারানোও ততই শক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। অতএব অচিরে ওদের আত্মপ্রত্যয়ে ঘা দিতে আরম্ভ না করলে ওদের হারানো অসাধ্য হয়ে উঠবে। এই সূত্র।

ঘা'টি কীরূপে দিতে হবে?

পাঁচশো বিমান হাতে থাকলে বোমা দিয়ে ঘা দেওয়া যেত। কিন্তু তা নেই। লাঠি থাক্‌লে লাঠ্যৌষধি প্রশস্ত, কিন্তু না থাকলে? না থাকলে অন্যভাবে ঘা দিতে হবে—যেমন মহাভারতে দ্রোণকে দেওয়া হয়েছিল যুধিষ্ঠির মারফৎ অশ্বত্থামার মিতা গজের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে।

ধরো, জাপানের দুর্ধর্ষ বন্ধু জার্মানি, জাপানেরই তুল্য 'অজেয়' —তারা যে রুশ রণভূমে নাকানি চোবানি খাচ্ছে সে খবর যদি আরাকান ফ্রণ্টের জাপানী সৈন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তবে কীহয়? জাপানীদের দম্ফাই একটু কমে না? কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের

খবরটা—জাপানী বহর চলেছিল মিড্ওয়ে দ্বীপ বরাবর, মার খেয়ে পেছ্পা হয়েছে?

কিন্তু কী ক'রে খবরটি যথাস্থানে পেঁছে দেওয়া যায়?

নস্যি, নস্যি। ফ্রন্টে ফ্রন্টে লাউড স্পীকার লাগিয়ে দাও, শোনাও জাপানীদের খাঁটি খবর। ভাবছ উদ্ভট খেয়াল? মোটেই নয়। চীনে মাও-সে-তুং-এর অষ্টাদশ আর্মি গ্রুপ হরদম একাজ করেছে। জাপানীরা যেই কোথাও আড্ডা গাড়ে, অমনি সেখানে চীনাদের লাউড স্পীকার রা-রা শব্দে প্রপাগ্যান্ডার প্রলয় লাগিয়ে দেয়। উড়ো খবর? আমরাও ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু ইংরেজ বাচ্ছা মাইক্ লিন্ডসে যখন স্বকর্ণে শুনে এসে আমাদের জানান্ দিলে তখন বুঝলাম ঘটনাটা সত্যি, তাপ্পি নয়।

তাও নয় হ'ল। কিন্তু ভাষা সমস্যা? জাপানীদের গুটি দুই অফিসার হয়ত ইংরেজী বোঝে, কিন্তু তাদের অক্ষৌহিণী? তারা তো জাপানী ভিন্ন আর কিছু জানে না। তাদের কোন্ ভাষায় খবর শোনানো হবে?

বিলেত থেকে সদ্যাগত হেসে বললেন, "সে-বন্দোবস্ত না ক'রে আসিনি।

কী সে বন্দোবস্ত জানবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

* * *

আমাদের ইউনিটের হাসিখুশী মেজর একদিন বললেন, "ওহে হ্যাভিল্ডার, বড় সায়েব তোমাকে একবার ডেকেছেন।"

বল্লাম, "আজ্ঞে।"

মেজর বললেন, "কী ব্যাপার, সায়েবের শ্রীমুখ থেকেই শুনো। শুধু ব'লে দিচ্ছি, কিছুদিন খুব আমোদ-আহ্লাদে কাটাবার একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাবধানে কথা কোয়ো। বেমক্কা কিছু ব'লে ফেলে ফূর্তিটা মাটি ক'রে দিও না যেন।"

দু

বললাম, "একটু হিন্ট্ দেবেন না স্যর? শেষে না জেনে এলোমেলো কিছু ব'লে ফেল্‌ব?"

মেজর বললেন, "শুধু বোলো যে তুমি বেহালা বাজাতে পারো। ব্যস্, আর কোনো কথা নয়, এক্ষুনি যাও।"

বেহালা! কী দুর্গ্রহ! কস্মিণো যে বাজাইনি। এই উন্মত্ত মেজরকে নিয়ে যে কী ঝন্‌ঝটে পড়েছি তা বলবার নয়। তবু গুরু-বাক্য অবহেল্‌তে নেই, ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে ব্রিগেডীয়ারের কামরায় ঢুকলাম।

সেলুট-আদি নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল, কিন্তু ব্রিগেডীয়ার তথাপি নীরব। ভদ্রলোকটির একটিমাত্র চক্ষু সক্রিয় (অন্যটি সেই ভুবনবিখ্যাত মহাসমরে হারিয়েছেন যেটাতে জার্মানীর নৃশংস আক্রমণ থেকে আর্ত বেলজিয়মকে রক্ষা করতে গিয়ে ব্রিটেন জার্মানীর আফ্রিকা দেশীয় উপনিবেশগুলো পেয়ে যায়)। সেই একটি চোখে দু চোখের দ্যুতি জড়ো ক'রে ব্রিগেডীয়ার আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন—ঝাড়া পাঁচ মিনিট।

এই নিরীক্ষণের ডাকনাম "সী-ও টেক্‌নীক"—অর্থাৎ উচ্চ সামরিক কর্মচারী কর্তৃক আসন্নপ্রমোশন সৈনিকের গুণাগুণ নির্ণয় —লক্ষণদৃষ্টে। জ্যোতিষে এর নাম কাকচরিত্র। যাঁরা শুধু প্রশংসা-পত্র বিচার ক'রে প্রমোশনের যোগ্যতা নিরূপণ করেন তাঁরা কোষ্ঠী-বিচারী জ্যোতিষী। আর যাঁরা শুধু লক্ষণ দেখেই ভূত-ভবিষ্যৎ বুঝে নেন তাঁরা হনুমানমতের। আর্মিতে এই মতেরই চল বেশী।

বেসামরিক মৌখিক পরীক্ষা "ভাইভা ভোসী" আর সামরিক সী-ও টেক্‌নীকে কতকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু প্রভেদও আছে। ভাইভা-র প্যাঁচটা হচ্ছে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পরীক্ষাধীন ব্যক্তির ক্ষ্যামতার দৌড়টা বুঝে নেওয়া। সী-ও টেক্‌নীকে কথাবার্তার পাট নেই। অভিনেতা যাচাই করার সঙ্গে এ টেক্‌নীকের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এমন এমন অভিনেতা আছে যারা নিজে পার্ট বলবার সময় সিংহপ্রায়, কিন্তু অন্যে যখন পার্ট বলে তখন তারা হয় কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে, নয় অনাবশ্যক উস্‌খুস্ ক'রে প্লেটা মাটি ক'রে দেয়। অভিনেতার ওজন বোঝা যায় তার নীরব অভিনয় দেখে। সী-ও

টেক্‌নীকেও পরীক্ষক একাধারে প্রেক্ষাগৃহ, দর্শক, ফুটলাইট, টপ-লাইট সেজে চেয়ে দেখেন প্রম্পটার চুপ মেরে বসে থাক্‌লে খেলোয়াড় কী দরের মূক অভিনয় করেন—তখন বোঝা যায় পরীক্ষাধীন ব্যক্তি হবু-তিনকড়ি চক্রবর্তী-শিশির ভাদুড়ী, না পোস্ত-পল্লীর প্যালারাম।

নিরীক্ষণে হঠাৎ ক্ষান্ত দিয়ে ব্রিগেডীয়ার একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার দ্বারা কী কী কাজ হতে পারে। চট্‌পট্ জবাব দিলাম, "আমি স্যর সমস্ত রকমের ড্রিল জানি, মায় ক্যানেডিয়ান ব্যাটল্‌-ড্রিল। ব্রেন-গান, হাল্‌কা মেসিন-গান, তিন ইঞ্চি মর্টার, এসমস্তও আমার—"

"না, না, আমি ওসবের কথা বলছি না। আমি জানতে চাই তোমার কোনো বিশেষ দক্ষতা, বিশেষ ক্ষমতা আছে কিনা। তার সঙ্গে যে যুদ্ধের সংশ্রব থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই।"

মেজরের কথাটা স্মরণ হলো। বুক ঠুকে ব'লে দিলাম, "হ্যাঁ স্যর, আমি বেহালা বাজাতে জানি।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুক জয়ঢাকের মত ঢীপ ঢীপ করতে লাগ্‌ল।

খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে ব্রিগেডীয়ার বললেন, "বলো কি হে! অমন দুরূহ যন্ত্র তুমি আয়ত্ত করেছ?"

কথাটা যখন একবার বলা হয়েইছে তখন তো আর তাকে ফেলা যায় না। পাড়ার মান রাখতে হবে। আর যুদ্ধে যখন নাম লিখিয়েছি তখন মরে তো গেছিই একরকম—এখন রামে মারে কি রাবণে। বললাম, "এলেম ছিল স্যর, ওস্তাদ বলতো হাত বড় মিঠে, তাই যত্ন ক'রে শিখিয়েছিল। মিউজিক কম্পিটিশন টিশনে বাজিয়েছি, মেডেল কাপ্‌ও পেয়েছি।"

ব্রিগেডীয়ার ঘন ঘন পাইচারী করতে আরম্ভ করলেন। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন,—

"স্বভাবদত্ত ক্ষমতা! স্বভাবদত্ত ক্ষমতা চাই, শুধু ঘষে ঘষে হয় না। এই কথাই আমি একটু আগে মেজরকে বলছিলাম। আমার স্ত্রী আজ কুড়ি বচ্ছর ধ'রে বেহালা বাজাচ্ছেন, কত ওস্তাদের কাছে শিখলেন, ঊনিশ-বিশ কিচ্ছু হ'ল না। আজ সকালে এক চিঠিতে

উনি লিখেছেন, এতদিনে ধরা পড়েছে কেন ও'র বেহালা বাজানোর উন্নতি হচ্ছে না।"

একটু থেমে পাইপ ধরিয়ে কাতরস্বরে ব্রিগেডীয়ার বললেন, "ও'র ধারণা, আসল দোষ যন্ত্রের। সম্প্রতি একটি যন্ত্রও উনি দেখেছেন, সেটি পেলেই নাকি ও'র হাত খুলে যাবে। সে যন্ত্রের দাম শুনলে তোমার পিলে চম্‌কে যাবে।"

আমি মিষ্টি ক'রে বল্‌লাম, "অবশ্য যন্ত্রেও সুরের খোল্‌তাই হয় বৈকি। ধরুন না, হাইফেৎসের স্ত্রাদিভারিউস্‌।" (সিনেমালব্ধ জ্ঞান।)

সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ব্রিগেডীয়ার বললেন, "তা বটে, তবু স্বভাবদত্ত ক্ষমতাও চাই। কী হাঙ্গাম যে আমাকে পোয়াতে হয়েছে স্ত্রীর বেহালাবাতিকের দরুণ। ফি বছর ছ' বার বাড়ি বদল করতে হয়েছে পাড়াপড়শীর নালিশে—ও'র বেসুরো বেহালার ক্যাঁ কোঁয় ওদের নার্ভে নাকি তুরপুন চলে।"

আমি ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বললাম, "এ অন্যায়! হাজার হলেও একটি আর্ট তো। পাড়াপড়শীদের দু' দিন সয়ে থাকা উচিত ছিল। দেখুন স্যর, আমার মনে হয় যে, ঐ পাড়াপড়শীদের অন্যায় অত্যাচারেই হয়তো আপনার স্ত্রীর মনে একটা ভয়, একটা ইন্‌-ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স ধ'রে গেছে, তাই ও'র হাত আড়ষ্ট হয়ে আছে। যদি উনি কিছুদিন নিরিবিলি কোথাও রেয়াজ ক'রে হাতের জড়তাটা কাটিয়ে নিতে পারেন তবে হয়তো চিরকালের মত ও'র ভয় ভেঙে যাবে।"

ব্রিগেডীয়ার বললেন, "অ্যাঁ? তুমি যে একেবারে নতুন ধরনের কথা বল্‌ছ। কিন্তু কথাটা বেশ মনে লাগছে তো। আমার এক মাস্‌তুতো ভায়ের সমুদ্রের ধারে ছোট্ট খুব একটি নিরিবিলি কুঁড়ে মত আছে বটে, তাকে একবার লিখে দিই? আমার স্ত্রীকেও বলি কথাটা—আপাতত নতুন বেহালা কেনাটা স্থগিত থাক্‌। ওঃ, তুমি একটা দুর্ভাবনা কাটালে হে।"

প্যাডে একটি ছোট্ট নোট ক'রে ব্রিগেডীয়ার বললেন, "হ্যাঁ, যে জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম। ব্যাপারটা সাতিশয় গোপন, অফিসার

ভিন্ন কাউকে বলা বারণ, তবে তোমাকে আর বল্‌তে বাধা নেই কারণ অবিলম্বে তোমাকে অফিসারের পদ দেওয়া স্থিরই ক'রে ফেল্‌লাম (করমর্দন, সেলুট ও প্রতি-সেলুট)। তোমাদের ফ্রণ্টে যেতে হবে, খুব শিগ্‌গির। এবারে আর ব্রেনগান্‌ বইতে হবে না; এ দফায় তোমাদের ইউনিটের অস্ত্র লাউড্‌ স্পীকার।''

সর্বনাশ! ফৌজী দিল্‌খুশা সভা—ফ্রণ্টলাইনের সেপাইদের চিত্তবিনোদনের জন্য গানবাজনার উজ্জুগ! আমার দফা নিকেশ। রাজপুতেরা মাণ্ড্‌ শুনতে চাইবে, পাঞ্জাবীরা চিম্‌টার গান। না শোনালে সঙ্গীন দিয়ে আমার নাড়িভুঁড়ি টেনে বার ক'রে কাবাব বানাবে। কাঁদ-কাঁদ মুখে জিজ্ঞেস করলাম, ''আমাকে কি বেহালা বাজাতে হবে স্যর?''

ব্রিগেডীয়ার বল্‌লেন, ''বেহালা! জাপানীরা কি বেহালা পছন্দ করবে? না হে, জাপানী রেকর্ড যা লণ্ডন থেকে পাঠিয়েছে তাই বাজানো যাবে।''

ও বাবা, ফ্রণ্টলাইনে লাউড স্পীকার, তাতে জাপানী গান বাজানো হবে! ব্যাপার অতীব কুট—মেজরের কাছে ঘাঁত ঘোঁত সাফ্‌ সাফ্‌ বুঝে নিতে হবে। প্রকাশ্যে বল্‌লাম, ''ঠিক কথা স্যর, গানের বেলায় সব মক্কেলই ঘরকুণো।''

ব্রিগেডীয়ার বললেন, ''যা বলেছ, সেই যে জেরোমের বইয়ে আছে, ওপরচালাকের দল জার্মান হাসির গান শুনে মুখ গোমড়া ক'রে বসে থেকে করুণ গান শুনে হেসে কুটিপাটি হয়ে নাকাল হয়েছিল, সেই-রকম হয় অপাত্রে রস ঢাল্‌লে। আমারই কথা ধরো না কেন। আমি যে সঙ্গীতে নেহাৎ অরসিক তা নয়, বাখ্‌ হাণ্ডেল্‌ আমার শোনা আছে। কিন্তু হালে যেসব চাল চল্‌ছে—যেমন আমাদের উইলিয়ম ওঅল্‌টন, সেগুলোকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। আমার স্ত্রী বিস্তর চেষ্টা করেছেন আমাকে ''বোঝাতে'' কিন্তু ও-জিনিস কি জ্যামিতির থীয়রেম যে বোঝাবে? আমার বাপু সেই ছেলে-বেলায় শোনা মোৎসার্টই ভালো লাগে।''

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ তো তত্ত্বকথা, কিন্তু আমার

কাজখানা কী? চকিতে আমার ভাবখানা বুঝে নিয়ে ব্রিগেডীয়ার সুকৌশলে বক্তৃতার মোড় ফেরালেন।

"তবে হ্যাঁ, চর্চায় কী না হয়। তোমার তো দেখছি প্রাচ্য পাশ্চাত্য দু'রকম সঙ্গীতেই দখল আছে, হয়তো বারকয়েক জাপানী রেকর্ডগুলো শুনলে আস্তে আস্তে তারও মর্ম তুমি বুঝে নেবে। আমি ভাবছি ফ্রণ্টলাইনে রেকর্ডগুলো বাজাবার ভার তোমারই হাতে দেবো। কী বল?"

এ প্রশ্নের দু'রকম উত্তর হয় না একটাই হয়; সেইটেই দিলাম, "নিশ্চয়ই স্যর"।

হাসিখুশী আনুপূর্বিক শুনে হেসে গড়াগড়ি। বললে, "দি আইডিয়া—সমুদ্রতীরে ব্রিগেডীয়ারপত্নী সরগম্ সাধছেন—ঢেউগুলো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বল্‌ছে হয়নি, হয়নি, ব্রিগেডীয়ার-জায়া আবার শুরু করছেন টুকরোটা—স্থানীয় সংবাদপত্রে ছবি ছাপা হচ্ছে—বিংশ শতাব্দীর নারী ডেমস্থেনেস্—ব্যায়লায় বাগ্মিতার তালিম নিচ্ছেন—"

আমি বললাম, "স্যর—"

মেজর বললেন, "সর্বক্ষণ স্যর-স্যর করো না। অফিসার হচ্ছ, এখন থেকে 'ওল্ড বয়' বলা অভ্যেস করো। কী বক্তব্য?"

আমি বললাম, "আমার যে-শহরে জন্ম সেখানে একটি রেডিও স্টেশন আছে। তা'তে অনিবার্য কারণে যদি কোনো আর্টিস্ট গরহাজির হন স্টেশন বাধ্য হয়ে রেকর্ডে যন্ত্রসংগীত বাজায়। কিন্তু লোকে এই নিয়ে বড় হাসাহাসি করে। অনুরূপ ঘটনা যদি ফ্রণ্ট-লাইনে ঘটে—তাও মাত্র বারোখানা জাপানী রেকর্ড সম্বল—তা হলে কি শুধু হাসাহাসিই হবে, শ্রাদ্ধ আরো গড়াবে না? বাঙালী রসিক জাত, হাসি দিয়ে অনেক দুঃখ ঢেকে রাখে; কিন্তু জাপানীদের একগুঁয়ে ধাত, ওরা যদি একঘেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতেব ঘ্যানোর ঘ্যানোরে খেপে উঠে আপদটার মূলোচ্ছেদ করবার জন্য দলে দলে খাপখোলা তলোয়ার বাগিয়ে আমারই দিকে ধেয়ে আসে?"

মেজর বললে, "কেন? তুমি তোমার স্ত্রাদিভারিউসের তৈরী ব্যায়লাখানা কাঁধে ঠেকিয়ে ছড়ে একটি মনোহর টান দেবে। অর্ফেউসের

বীণার তানে উন্মনা পশুপক্ষী যেমন তার চারপাশে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকত, তেমনি জাপানীরাও জড়ো হবে তোমার পাদমূলে, মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনবে তোমার আঙুলের গিট্‌কিরি। তাদের একশোখানা খোলা তলোয়ার গোল হয়ে তোমাকে ঘিরে থাকবে, যেন শতদল পদ্ম! ছড় চল্‌বে অবিরাম, কখনো বিলম্বিত কখনো দ্রুত লয়ে, যেন পরাগ-কেশরটি মৃদুমন্দ বায়ে আন্দোলিত হচ্ছে।—খবদ্দার বাজনা যেন না থামে কভু, তা হলেই দম্‌কা হাওয়ায় খসে-যাওয়া ফুলের পাঁপড়ির মত তলোয়ারগুলো উড়ে কোথায় গিয়ে পড়বে কে জানে!"

সর্বক্ষণ লোকটির ঐ এক রকম। লঘুগুরু জ্ঞান নেই বল্‌তে পারি না কারণ কাজের সময় এক চুল এদিক ওদিক হলে রেগে আগুন হয়ে যায়, কিন্তু বাকীবাদ সময় লোকটা খালি এমনি হাসে আর হাসায়। মাঝে মাঝে বড় বড় অফিসারদের সামনে ন্যাকা সেজে গম্ভীর মুখ ক'রে থাকে, সে আরও বিপদ, দেখলে হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

বললাম, "না না সত্যি, বেহালা বাজাই না বটে, কিন্তু বাঙালী তো—নিত্যি তিরিশদিন বারোখানা রেকর্ড শুনতে শুনতে আমি নিজেই খেপে উঠবো যে!"

মেজর বলল, "ভয় নেই হে। শুধু গানই নয়, অন্য পালাও আছে। সময়ে জানবে।"

কি লজ্জা, কি লজ্জা। শেয়ালদা স্টেশন ভরতি দিশী-বিলিতি ফৌজ, কেউ পদাতিক, কেউ কামানদাগ, কেউ খচ্চর খিলায়, কেউ ট্রাক চালায়, কারো কাজ রসদ সরবরাহ, কারো সংবাদ আদান-প্রদান, আর তাদের মধ্যে আমাদের লাউড স্পীকার ইউনিট হংসমধ্যে বকো যথা! অন্যদের কারো ঘাড়ে কিটব্যাগ, কারো ঘাড়ে পেল্লায় ঝোলা, আমাদের জওয়ানেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাউড স্পীকারের চোঙা—অবশ্য চট দিয়ে মোড়া, কিন্তু ভারতবিখ্যাত হোশিয়ারপুরী হবুগবুরাও দেখেই বুঝতে পাবে ওটা সামরিক তালিকাভুক্ত কোনো মাল নয়। সবাই

ধরে নিল ওটা একটা মোক্ষম রগড়—টিট্‌কিরির গর্‌রা পড়ে গেল।

কলেরা, টাইফয়েড, ধনুষ্টঙ্কার, তিনেরই ইন্‌জেকশন এক কিস্তিতে নিয়ে শরীর জরজর, তার ওপর আবার এই টিট্‌কিরির বিষে মেজাজ আরো খিঁচে গেল। মাল কোনোমতে লগেজভ্যানের সার্জেণ্টের কাছে জমা দিয়ে, আর কারো সঙ্গে বাক্যালাপ না ক'রে বরাদ্দ কামরায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ধুঁকতে লাগলাম। কামরাটি সেকেণ্ড ক্লাস 'কুপে,' তার দ্বিতীয় প্যাসেঞ্জারটিও এলো না। আমি ছিটকিনি আট্‌কে দিলাম।

হঠাৎ দরজায় ধড়াধ্বড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমি মহা বিরক্ত হয়ে বল্‌লাম, "কোন্ হ্যায়?"

জবাব এলো. "আমি মেজর, ওল্ড বয়। দরজাটা একটু খোলো।"

আচ্ছন্ন দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে ছিটকিনিটা খুল্‌লাম। দরজাটা ফাঁক ক'রে দেখি, মেজর এবং দ্বিতীয় এক ব্যক্তি। ঘুটঘুটে অন্ধকার, মেঘলা রাত্তির, টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। স্টেশনে ব্ল্যাক আউট, গাড়িতেও আলো নেই।

দ্বিতীয়ের হাতে টর্চ ছিল। তিনি সেটা জেবলে প্রথমত আমার মুখখানি দেখলেন, তারপর আমার উর্দি এবং সামরিক পদমর্যাদার তকমা। তারপর তিনি টর্চের মুখ ঘুরিয়ে গাড়ির দরজার উপর লেখাটি নিবিষ্টচিত্তে দেখে বল্‌লেন,—

"কিন্তু এটা তো দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা!"

মেজর বললে, "গন্তব্যস্থান একই—সব নদনদী গিয়ে মিলেছে সাগরে। চড়ে পড়ুন, কাল দেখা হবে রাত না কাট্‌তে।"

অন্য ব্যক্তি বল্‌লেন, "মাপ করবেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমি চড়বো না। আমাকে লণ্ডনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, আমাকে অন্তত ব্রিগেডীয়ারের প্রাপ্য সম্মান দেখানো হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমি চড়বো না।"

মেজর বল্‌লে, "থিক হায়, চলুন, আপনাকে সসম্মানে প্রথম

শ্রেণীতে চড়িয়ে দিয়ে আসি। ওহে ওল্ড বয়, দরজাটা বন্ধ কোরো না, এখুনি আসছি।"

খানিক বাদে বিছানাপত্র নিয়ে মেজর আমার কামরায় চলে এল। আমাকে ওপরের বাঙ্কে চড়তে না দিয়ে নিজেই সেখানে পরিপাটি বিছানাটি ক'রে শুয়ে পড়ল। আমার জ্বর এবং ঘুম বেমালুম উবে গিয়েছিল; আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্রিগেডীয়ারতুল্য লোকটি কে, কী এবং কেন। মেজর সংক্ষেপে বললে,—

"কোরীয় হে, আমদানী লণ্ডন থেকে—তুমি তো শুন্‌লে।"

কোরীয়ার লোক! 'জাপানযাত্রীর পত্রে'র অন্যতম পাত্র। এখানে? এ কি স্বপ্ন না আরব্যোপন্যাস!

"কাউকে বোলো না হে—ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের ব্যাপার। দেখছ না শেয়ালদায় ইনি ট্রেন ধরেননি, বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে শহরতলীর একটা ক্ষুদ্র স্টেশন থেকে এঁকে তুলে নেওয়া হ'ল। আমাদেরই সঙ্গে যাবেন, তোয়াজে রেখো।"

সে রাতে আর দু' চোখ জুড়লো না। নানা চিন্তা, অনুমান, জল্পনা-কল্পনা মাথায় ঘুরতে লাগ্‌ল। মেজরেরও বোধ হয় মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, থেকে থেকে তার কথার স্রোত বইতে লাগ্‌ল।

"মহাপরাক্রান্ত এই কোরীয় ধুরন্ধরের আসল নাম কী আমরা কেউ জানি না। শুনেছি, কেবল চার্চিল, রোসভেল্ট আর গুটি দুত্তিন লোক জানেন—হিঃ হিঃ হয়তো বা ওঁরাও শুধু এঁর একটা ছদ্মনামই জানেন। হয়তো এঁর অবস্থা মিশরের আদিদেবতা রা-র মত। জানো তো, ও-দেবতার প্রকৃত নাম রা নয়, ওঁর খুব গুপ্ত একটা নাম আছে সেইটেই খাঁটি; কিন্তু সেটা যে কী তা কেউ জানে না কারণ তিনি সেটি এক দেবী আইসিস্ ছাড়া আর কারো কাছে ফাঁস করেননি, তাও সঙ্গোপনে, আর আইসিস্‌ও সে-নাম দু কান করেননি। হিঃ হিঃ, এমনও তো হতে পারে ধুরন্ধর নিজেও নিজের নামটি ভুলে মেরে দিয়েছেন।

আচ্ছা, কী হয় বলো তো, এই ব্যক্তি যদি কোনোদিন স্বাধীন কোরীয়ার রাজাটাজা কেউ হয়? খবরের কাগজে সে-খবর পড়েও আমরা জান্‌তে পারব না এই লোকই রাজা হ'ল—আদত নাম জানি

না যে। চার্চিল রোসভেল্টও হয়তো জানতে পারবেন না। তারপর ধরো যদি কোনো আন্তর্জাতিক বৈঠকে ওঁদের হঠাৎ দেখা হয়, চার্চিল হয়তো পিঠ চাপড়ে বল্‌বেন,—

"আরে পং যে! কী খবর, কোথায় আছ? বহুদিন তোমার কোনো খবরাখবর পাইনি। তারপর, সব ভালো তো?"

এ-ব্যক্তি হয়তো কাঠের মত শক্ত হয়ে বল্‌বে, "যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, মহাশয়ের সহিত এখনো আন্তর্জাতিক বিধি-সম্মত পদ্ধতি অনুসারে আমার পরিচয়ের কেতাদুরস্ত অনুষ্ঠান যথাযথ সম্পূর্ণ হয় নাই, তথাপি মহাশয়ের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে. মহাশয়ের সহিত বাক্‌রত ব্যক্তি পং-আখ্যেয় কেহ নহে পরন্তু স্বাধীন কোরীয়ার সর্বাধিনায়ক নিউন হুক পিউন। সুপ্রভাত।" যদি তাই হয় তবে চার্চিলের চেহারাখানা কী রকম দাঁড়াবে বলো দেখি!"

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না। মেজর বললে, "তবু ওকে আরও একটা নতুন নাম দিতে হবে এই দফায় ব্যবহারের নিমিত্ত। বাংলাও দেখি একখানা নাম।"

আমি বললাম, "সব্যসাচী।" তাৎপর্যও বুঝিয়ে দিলাম। মেজর ভেবে বলল, "নাঃ, বড্ড বড় নামটা আর কেমন গম্ভীর। আমি চাই একটা নাম যা নিয়ে একটু ফষ্টিনষ্টি করা যায়। থিক হায়, পেয়েছি নাম। কলকাতায় একটা সিনেমা দেখে এলাম তা'তে এক রহস্যময় চরিত্র নানা লীলাখেলা দেখিয়েছেন, তারই নাম দেওয়া যাক একে—বু। ডাক্তার বু।"

বু। অন্তঃস্থ ব। ডবলিউ।

সকালে স্টীমারে যথারীতি আলাপ হ'ল ডাক্তার বু-র সঙ্গে। ফর্সা দুধে-আল্‌তা রঙ, কুচ্‌কুচে কালো চুল পরিপাটি ক'রে ফেরানো, চোখে আটকোণা কাঁচের ফ্রেমহীন চশমা। গায়ে ধোপদস্ত শানটুং সিল্কের কামিজ, পায়ে সযত্নে ভাঁজ করা উৎকৃষ্ট কাপড়ের পাতলুন আর সাদাকালো চককাটা জুতো। পাতলুন আর জুতোর মাঝে আধ ইঞ্চি ফাঁক, তার ভিতর থেকে সূক্ষ্ম রেশমী মোজা উঁকি

মারছে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা। চোয়ালের ও কণ্ঠার হাড় উঁচু, কিন্তু হাড়ে মাংস আছে, রোগা নয়।

ফৌজের ভিড় স্টীমারের একতলায়, সেখান থেকে সবুট পদক্ষেপের রূঢ় ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হরিয়ানা-জলন্ধর-নওশেরা-রাওয়ালপিণ্ডির নানা আদ্যঝোঁকের ভাষা উপভাষার বিস্ফোরণ। দোতলায় নির্জন ফার্স্টক্লাস ডেকে আমি আর বু; মেজর আমাদের আলাপ পর্ব সমাধা ক'রে দিয়েই নীচে চলে গেল, বোধ হয় জওয়ানদের সঙ্গে ফক্কুড়ি করতে।

বু আমাকে জাহাজের রেলিঙের কাছে নিয়ে গিয়ে চাপাগলায় জিজ্ঞেস করল, "মেজর বললেন, তুমি অফিসর, অথচ তোমার তো উর্দি হাবিলদারের। হাবিলদারের তো ফার্স্ট ক্লাসে চড়ার নিয়ম নেই।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এত জানলে কী ক'রে?"

বু পুলকিত হয়ে বললে, "আমাকে চরকির মত সারাবিশ্ব ঘুরে বেড়াতে হয় সর্বক্ষণ। গত পঁচিশ দিনের ভেতর চুংকিং ওয়াশিংটন লণ্ডন কাইরো দিল্লী ঘুরেছি। আমার কি ঢিমে তেতালায় চললে চলে? আমি এক আঁচড়ে সব বুঝে নিই। তোমার ব্যাপারখানা সত্যি সত্যি কী বলো তো? পদোন্নতি কোথাও আট্‌কে আছে? দিল্লী রাজী হচ্ছে না? খুলে বলো সব। আমি দু' চার দিনের মধ্যেই আবার দিল্লী যাচ্ছি, তোমার ঊর্ধ্বতন অফিসরদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, আমি ব'লে দেব। খাতির-টাতির করে তো আমাকে—আমার কথা রাখবে।"

আমি গদগদ হয়ে বললাম, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

বু জিজ্ঞেস করলে, "আমি কে জানো?"

আমি বললাম, "কেন, ডক্টর বু?"

বু একটু হেসে আবার জিজ্ঞেস করল, "ইতাগাকি হত্যা-কাণ্ডের খবর পড়েছ? সেই যে তোকিওতে ক্যাবিনেট মিটিং-এর পর—"

আমি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সিঁড়ি

দিয়ে নেবে গাড়িতে চড়বার মুখে অদৃশ্য আততায়ীর বুলেটে নিহত। সম্ভবত জাপানের ভীমবল "কালো ড্র্যাগন" গুপ্ত সমিতির কাজ—"

মাথা নেড়ে বু বললে, "ভূয়ো খবর। আসলে তার মূলে কে ছিল জানো?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

বু চোখটি বুজে, মাথাটি একটু ডানদিকে হেলিয়ে, নিজের তর্জনী নিজেরই দিকে ফেরাল।

আমি সভয়ে, সবিস্ময়ে বললাম, "আপনি?"

বু নীরবে মাথা নেড়ে জানাল, হাঁ। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, "নোমুরা এবং ইতো যে আজ জাপানের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে অপসৃত হয়েছে তা জানো তো?"

আমি বললাম, "জানি বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে গুজব শুনেছি জাপানের মিন্‌সেইতো দলের প্রবল আপত্তিতে ওই দুই ব্যক্তি অবসর গ্রহণ করেছে।"

বহু দূরে এক সার পদ্মার ইলিশমাছের নৌকোর গেরুয়া নীল শাদা পালের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বু বললে,—

"নোমুরা-ইতো শুধু জাপানের রাজনীতি থেকে নয়, ভূপৃষ্ঠ থেকেও অপসৃত হয়েছে। মিন্‌সেইতোর তাতে কোনো হাত ছিল না। কী ক'রে থাক্‌বে? আজ জাপানে তথাকথিত উদারপন্থী মিন্‌-সেইতো আর রক্ষণশীল ৎসে ইউ কাই দলে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই—একথা জেনে রেখো। নোমুরা-ইতোর শেষ যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছিল কে জানো?"

"না।"

আবার বু তর্জনী সঙ্কেতে জানালে সে-ই, সে নিজে। ক্রমে ক্রমে জানা গেল, গত দশ বছরের মধ্যে কী জাপানে, কী মাঞ্চুকুয়োয়, কী জাপান-অধিকৃত চীনে অথবা অন্যত্র জাপানী রাজশক্তির উপর সামরিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক, কূটনীতিক যতগুলো চোট লেগেছে তার সবার মূলে ছিল বু।

"আমার দলের লোক সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমার সদাসর্বদা যোগ রয়েছে; আমার কাছে সমস্ত খবর আস্‌ছে,

আমার হুকুম তাদের কাছে যাচ্ছে—গুপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষায়। আমাদের কাজের কৌশলটি নিখুঁত। এমন সাজিয়ে কাজটি সারা হয় যে, সন্দেহটা গিয়ে অন্য কোনো দলের ওপর পড়ে। ইতাগাকিকে কতল করলাম আমরা, দোষ চাপ্‌ল 'কালো ড্র্যাগনে'র ঘাড়ে। এম্‌নি কি হয়? প্ল্যান ক'রে কাজ গুছোতে হয়। সে প্ল্যান কোথায় তৈরি হয় জানতে চাও?—এইখানে।''

আবার পদ্মপলাশনয়ন মুদ্রিত হ'ল। তর্জনীর ইঙ্গিত এবার বুর মস্তকের প্রতি। আমিও শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়লাম।

মেজরের আর চালে ভুল হয়নি। জাহাজের ভালো ক্যাবিনটি বু-ই পেলো, চট্টগ্রামের ক্যাম্পে সবচেয়ে ধপ্‌ধপে তাঁবুও সে-ই নিল। খাবারদাবার যা জুট্‌তো, বু-কে সবার আগে দিয়ে আমরা প্রসাদ পেতাম। কক্সবাজারে পথেও ট্রাকে-নৌকোয় অফিসররা কেউ ওঠার আগে বু-কে উঠতে বলা হ'ত, পাছে তার মনে শঙ্কা জাগে ব্রিগেডীয়ারের সম্মান থেকে তাকে বঞ্চিত করা হ'ল।

তবু শেষরক্ষে করা গেল না। কক্সবাজার থেকেই গোলমাল আরম্ভ হ'ল।

কক্সবাজারে তখন বে-সামরিক অধিবাসী প্রায় নেই। জাপানীদের শেষ ঘাঁটি শহরটি থেকে তখনও ৭০।৭৫ মাইল দূরে—দক্ষিণে, কিন্তু পূর্বে পাহাড় পেরোলেই ওদের আস্তানা, দয়া ক'রে টপ্‌কে এলেই হয়। জায়গাটিতে কেমন ছম্‌ছমে ভাব, বিশেষ আমরা যে সময়ে গিয়ে পৌঁছলাম তখন। থম্‌থমে গুমোট, সন্ধ্যে হব-হব, পথে জনমানব নেই, বাজার-হাট-গঞ্জ সব খালি।

ক্যাম্পটাও যেন কেমন কেমন। জরাজীর্ণ কতকগুলো দরমার ঘর, রোদ-বৃষ্টি আর ধুলোর প্রলেপে মাটি, বাঁশ, টিন সব একরঙা একাকার হয়ে গিয়েছে। যেন কতকগুলো ভিখিরীর পুঁটুলি। নমো নমো ক'রে স্নান সেরে অফিসারদের মেসে গেলাম, সেও অতি হতচ্ছাড়া। টিম্‌ টিম্‌ ক'রে একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে, শূন্য ঘরে গুটি দুই আমকাঠের তক্তার টেবিল আর বেঞ্চি—এর নাম অফিসারদের মেস্‌! আরদালীগুলোও বে-আদব, চেঁচিয়ে খাবার

দিতে বললাম, সাড়া দিলে না। অনেক খোশামোদ ক'রে যদি-বা কিছু জোগাড় হ'ল, তাও সে মুখে তোলে কার সাধ্যি!

মেজর সভয়ে বলল, "ওল্ড বয়, সব বানচাল হয়ে যাবার দাখিল যে, এ খাবার তো বু-কে দেওয়া যাবে না! একটা অনর্থ বাধবে দেখছি।"

মেজরের কথা শেষ হতে না হতে বু প্লেট, ছুরি, কাঁটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। 'এক আঁচড়ে সব বুঝে' নিয়ে মহামানব বললেন, "বন্দোবস্ত তো বেজায় কাঁচা দেখছি।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ডাক্তার বু, এসব রোথো জিনিস তুমি খেও না। এখনো আমরা বর্মায় ঢুকিনি, এখনো আমরা শক-হুণদল পাঠান-মোগল অধ্যুষিত পুণ্যভূমি ভারতে, এখনো তোমরা আমার দেশে আমার অতিথি। একটু ধৈর্য ধরে থাকো, আমি ব্যবস্থা করছি।"

বু বিরক্তমুখে বললে, "আমার আবার ঘড়ি-ধ'রে টাইমমত খাওয়ার অভ্যেস। তাছাড়া স্নান করার পরই খিদেটা দুর্দম হয়ে ওঠে—আর খিদের ঠিক মুখেই না খেলে খিদেটা একদম মরে যায়।"

ঝড়ের বেগে ছুটে গেলাম বেলুচ রিসালদার দোস্ত মহম্মদের কাছে। ঘটনাটি বুঝিয়ে দেওয়ামাত্র সে তাড়াতাড়ি তিনজনের যুগ্যি নান্ কাবাব, ডাল, আলু-গোশ্ত, আর খেজুর একটি জওয়ান মারফৎ পাঠিয়ে দিলো। আমি একটু থেকে দুটি সুখ-দুঃখের কথা ক'য়ে ফিরলাম। দু'পা যেতেই রিসালদার চেঁচিয়ে উঠলো—"ইয়ার, তোমার মেহ্মান নিরামিষাশী নয় তো? এসব খায়?"

আমি চেঁচিয়ে জবাব দিলাম, "শুধু কাঁটা, ছুরি আর চেয়ার-টেবিল খায় না, আর সব খায়। স্বচক্ষে দেখেছি।"

ফিরে এসে দেখি মেজর স্বহস্তে বু'র প্লেটের ওপর পাত্র উবুড় ক'রে দিতে দিতে বলছে—

"চার্চিলকে বোলো এসব কথা। তোমার স্বাভাবিক ঔদার্যবশত ভুলে যেও না যেন। কত কষ্ট হলো বলো দেখি তোমার!"

শুকনো মুখে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে মেজর আর আমি বু'র অগ্নিমান্দ্য নিবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। মনে নানারূপ

৩৮ ১৩

খেদ হতে লাগল। বনু বিপ্লবী; আমরাও ছেলেবেলায় বোমার দলে ভিড়েছি, মাৎসীনি গারিবাল্‌দির জীবনী প'ড়ে ডন-কুস্তি ক'রে দেশ স্বাধীন করবার বল সঞ্চয় করেছি। আমাদের ছেলেরা দুমদাম ক'রে গোলাগুলী ছুঁড়ে পটাপট ফাঁসি গেছে, দ্বীপান্তর হয়েছে। খাম্‌কা ওসব না ক'রে যদি আমরা বনু'র নিখুঁত কৌশলটি আয়ত্ত ক'রে নিতাম, দেখতে আজ ভানুমতীর খেল। বড়লাট বধ হ'ত, তার দরুণ হোম-মেম্বর শূলে চড়ত। বাজেটে বার বার তিনবার ঘাটতির লজ্জায় ফিনান্স মেম্বর দেশছাড়া হ'ত, সন্দেহবশে সেক্রেটারী অব স্টেটকে ঠাণ্ডি গারদে পুরে দেওয়া হ'ত। আর আমরা? আমরা দিব্বি গায়ে ফুঁ দিয়ে আজ মনট্রীঅল কাল টিম্বাক্‌টু ক'রে ঘুরে বেড়াতাম। হায়, গোড়ার ভুলে সব গেল!

পর পর সাতখানা শেখুপুরা বিস্কুট খেলাম। এই সামরিক বিস্কুট আর ভেনেস্তার তক্তায় তফাৎ স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে নয়—ভেনেস্তায় পোকা ধরে না, এ-ই আসল তফাৎ। এক গণ্ডুষ জল খাব সে উপায় নেই, কারণ আমাদের জলের বোতলে জল থাকত না, থাকত চা। জলের চেয়ে নাকি না-গরম না-ঠাণ্ডা দুধ-চিনিবর্জিত বোটকা চায়ের আরকের তৃষ্ণা-নিবারণী শক্তি প্রখরতরা! তাই খেয়ে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয়ের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'ল। আমাদের মানে বনু-র নয়, বনু-র তখনো বহু অনুষ্ঠান বাকী। রিসালদারের নান্‌গুলো ইয়া লম্বা, ইয়া পুরু—কুর্দিস্তানী রুটির মত, গোগ্রাসে গিলতেও তিনপো ঘণ্টা লাগে। তাছাড়া, তাড়াহুড়ো ক'রে খেলে বনু-র অম্বল হয়।

বাইরে একটা জীপ এসে থামল, কে একজন লাফিয়ে নেমে মেসের বারান্দায় উঠল। ঘরে না ঢুকেই লোকটা হাঁকল—"আরদালী!"

মেজর জবাব দিল, "জী?"

এইবার লোকটির মুখ দেখা গেল, হাঁড়িপানা, গাল-তোবড়ানো, স্বভাববিষণ্ণ মুখ। বললে, "কে হে রসিকপ্রবর?"

মেজর অত্যন্ত অশোভনভাবে লাফিয়ে উঠে গলা তারার সপ্তকের নিখাদের কাছাকাছি চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ফ্রেডি!"

"ফ্রেডি" হাঁ ক'রে মেজরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেজর

ছুটে গিয়ে বিপুল করমর্দন আরম্ভ ক'রে দিলেন। লোকটার তবু আড়ষ্টতা ঘুচল না। শুক্‌নো মুখ থেকে তার মাত্র দুটি কথা ফুটল, "আপনি কে?"

মেজর ফ্রেডির কাঁধ ধ'রে একটা রাম-ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি জর্জ, আবার কে?"

সজোরে মাথা নেড়ে ফ্রেডি বললে, "উঁহু, সে কী ক'রে হবে! জর্জ যে মারা গেছে, মরুভূমিতে তেষ্টায় ছাতি ফেটে মারা গেছে। তুমি অন্য লোক—কিংবা জর্জের ভূত।"

বু অঘাসুরের মত হাঁ ক'রে রাক্ষুসে এক-গ্রাস নান্-কাবাব গলায় ঠেলে দিচ্ছিল, হঠাৎ বিষম ঠেকে গ্রাসটা ফস্‌কে তার ধোপদস্ত পাতলুনে প'ড়ে গেল।

ফ্রেডি বলতে লাগল—"মানি জর্জের ক্ষমতা অসাধারণ, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। বেদুইনরা মরুভূমিতেই থাকে; তারাও কাত্তারার চোরাবালি পেরোতে পারে না, আর জর্জ পারবে? জর্জের সূক্ষ্মদেহের কথা বলছি না, সেটা হয়ত তিন লাফে কাত্তারা ডিঙিয়ে ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেমন জীবদ্দশায় বেড়াত—আমি বলছি জড়দেহটার কথা, সেটা প'ড়ে আছে কাত্তারার ধ্বসে-পড়া এক বালির স্তূপের কোন্ তলায়!"

.আমাদের দিকে চেয়ে অনাবশ্যক জোরে হাসতে হাসতে মেজর বলল, "বড় আমুদে লোক ফ্রেডি, হাসিয়ে মারে। কিন্তু ভদ্রতা শিখল না কোনদিন। এস ফ্রেডি, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিই।"

ঝোলা-পিস্তল-জলের বোতল নামিয়ে রাখতে রাখতে ফ্রেডি বলতে লাগল—"না বাবা, তুমি যাঁদের ঘাড়ে চেপে আছ তাঁদেরই ঘাড় মটকাও, আমার ঘরে স্ত্রী-পুত্র আছে, আমাকে রেহাই দাও। অবশ্য আমার ওষুদ আছে—আমার ঘোর ক্যাথলিক স্ত্রী আমার বুকে-পিঠে ক্রুশচিহ্নের উল্‌কি পরিয়ে দিয়েছে, তারই গুণে আজও বেঁচে আছি। কিন্তু তবু যতক্ষণ জর্জের কাত্তারা পেরোনোর একটা বিশ্বাসযোগ্য এবং সন্তোষজনক বিবরণ না পাচ্ছি ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে রাজী নই।"

আমি বনু-র গম্ভীর আননের দিকে আড়চোখে চেয়ে মেজরকে বললাম, ''আমাদেরও বড়ই ঔৎসুক্য হচ্ছে, সমুদায় বর্ণনা ক'রে কৌতূহলের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করুন।''

মেজর হেসে বললেন, ''বলব, যদি ফ্রেডি গল্পটা শুরু করে।''

টেবিলে বসে সবুট পা'দুখানি বেঞ্চির ওপর রেখে ফ্রেডি বলতে আরম্ভ করল ঃ

''স্থান উত্তর আফ্রিকা। আমাদের সেনাপতি অকিনলেক। জার্মানদের রমেল—ঘড়েল ব্যক্তি। হুট্ হুট্ ক'রে আমরা বেন-গাজী অবধি পেঁছে পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছিলাম এমন সময় রমেল হেট্ হেট্ ক'রে আমাদের তাড়িয়ে একেবারে মিশরে এনে পুরে দিলে। আগে ওয়েভেলও অমনি তাড়া খেয়েছিলেন, কিন্তু সেবারে আমাদের হাতের পাঁচ তবরুক বন্দর হাতছাড়া হয়নি। এবারে হ'ল। তিন দিকে জার্মানরা আমাদের ঘিরে ফেলল, চতুর্থ দিকে ''ইতালীয় হ্রদ'' মধ্যধরণী সাগর। আত্মসমর্পণ ভিন্ন গতি নেই।

এমনি বিষম সময়ে জর্জ (ভগবান তার আত্মার মঙ্গল করুন) চুপি চুপি আমাকে এসে বলল, 'ফ্রেডি, লড়াই তো খতম! এখন বীরের ন্যায় আত্মসমর্পণ না ক'রে চলো কাপুরুষের মত ভেগে পড়ি।' আমি বললাম, 'কিন্তু ম্যাপে তো বিশ মাইলের মধ্যে কোথাও জলাশয় নেই। পালাবে কোথায়?' জর্জ বললে, 'ম্যাপে নেই ব'লেই নেই? আলবৎ আছে। চল বেরিয়ে পড়ি তারপর দেখা যাবে আছে কি নেই।'

রাত্তিরে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লাম মিটমিটে তারার আলোয়। সাবধানে জার্মান শান্ত্রী এড়িয়ে, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে বেঁকে এসে পেঁছলাম মুসোলিনীর তৈরি পাকা রাস্তায়। সেই পথ ধ'রে খানিক চলি, আবার দূরে যানবাহনের শব্দ পেলেই মরুভূমির ওপর চোঁচা লম্বা দিই, আবার বিপদ কেটে গেলে পথের ওপর ফিরে আসি। এইভাবে সারা রাত চলে ভোর হবার খানিক আগে পথ ছেড়ে সোজা মরুভূমিমুখো হলাম—দিনের আলোয় রাস্তায় ঘোরা-ফেরা করলে গ্রেপ্তার অনিবার্য।

''দিনমান যে কিভাবে কাটল সে বর্ণনা করবার সাধ্য আমার

নেই। এখনো মনে করলে সারা দেহ শুকিয়ে দড়ি হয়ে যায়। দুপুর তো ওরে-বাপ্‌রে ওরে-বাপ্‌রে ক'রে গেল, বিকেল বেলায়ও নরক-যন্ত্রণার উপশম হ'ল না। মাঝে মাঝে দম নেবার জন্য বালির বড় বড় ঢিবিগুলোর তপ্ত ছায়ায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ব'সে প্রাণটা যদি-বা একটু ধুকধুকিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে চাগিয়ে ওঠে তেষ্টা। আর গোদের উপর বিষফোড়া হ'ল জর্জের সান্ত্বনা—'কিছু নয় ফ্রেডি, সব মনের ব্যাপার। মনে কর, আমরা কাইরোর শেপার্ড হোটেলে ব'সে ইয়া এক পাত্র ঠাণ্ডা বীয়ার খাচ্ছি—এই এক ঢোক! এই আরেক ঢোক!'

দ্বিতীয় দিনে জর্জ উৎফুল্ল হয়ে দেখালো ওয়েসিস্‌—মরীচিকা নয়, সত্যি সত্যি ওয়েসিস্‌—নিকটেই। তা' ব'লে ভেবো না চান্দিকে গুচ্ছ গুচ্ছ ডাব, খেজুর আর পান্থপাদপ! ওয়েসিসটিও নামসর্বস্ব —এই কক্সবাজারের অফিসার মেসেরই মত। ন্যাড়া ন্যাড়া কতক-গুলো খেজুর গাছ আর কাঁটার ঝোপ, তারি মধ্যিখানে দু-একখানা মাটির ঘর—বোধ হয় বাইবেলের হাম-শেম-এর আমলের, ধ্বংসাবশেষ-টুকু টিকে আছে—ভূগোলে এর নাম মরূদ্যান। জল অতি বিস্বাদ, লোহাকষের মত, কিন্তু তাই দিয়ে ভেতরের দাউ দাউ আগুন নেভাতে হ'ল; জর্জের হুকুম, বোতলের চা উন্মুক্ত মরুভূমিতে খাওয়া যেতে পারে—ঘণ্টায় দশ ফোঁটা ক'রে, কিন্তু ওয়েসিসে সে নবাবী চলবে না, যা আছে তাই খেতে হবে।

সন্ধ্যের ঝোঁকে জর্জ বললে, রাতটা সে ঘুমিয়ে নষ্ট করতে চায় না, চারপাশটা দেখে নিতে চায়, বিশেষ ক'রে উত্তর দিকটা। মুখে দু' বড়ি খাবার গুঁজে সে বেরিয়ে পড়ল তারার আলোয়। আমার বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না। অর্ধ-অচৈতন্য হয়েই ছিলাম, কম্বল মুড়ি দিতেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিনের আলোয় কি একটা শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখি—একজোড়া চোখ! ব্যস্‌, আমার দফা শেষ! ভয়ে চোখ বুজলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, জর্জ নয়তো, বেদুইন পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে? আবার চোখ খুললাম, এবারে মুখের ঢাকনা সরেছে। না, জর্জ নয়, বেদুইনও নয়, লোকটি যাকে

বলে শ্বেতাঙ্গ, মরুভূমিতে পুড়ে বাদামী মেরে গেছে। একমুখ কালো দাড়ি, কালো চোখ—নির্ঘাত ইতালীয়—আমাকে টানতে টানতে সোজা মুসোলিনীর কাছে নিয়ে বলি দেবে! আরেক দফা চোখ বুজলাম।

লোকটা বললে, 'অংগ্লে?'

ফরাসী! বন্ধুলোক!—না না, তা কি ক'রে হবে! প্যারিস যে জার্মানদের দখলে;.ফরাসী মার্শাল পেত্যাঁ হিটলারের—কেউ বলে বন্দী, কেউ বলে বন্ধু! অ্যাডমিরাল দারলঁ হিটলারের স্যাঙাৎ! ক্ষীণস্বরে বললাম,

'উঈ, হ্যাঁ! কামারাদ্, আত্মসমর্পণ করছি!'

এবারে দাড়িওয়ালা লোকটা আমার মুখের সামনে জলের বোতল খুলে ধরল। ধড়ে প্রাণ এল, উঠে বসবার চেষ্টা করলাম। এবারে আরেকটা শাদা পোশাকে মোড়া ফরাসী আমার সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে গড় গড় ক'রে কি সব বলতে লাগল......'সাক্রে দিয়্য'......মঁ ভিয়্য......' মনে হ'ল খুব পুলকিত হয়েছে। তারপর হঠাৎ আমার খোলা কামিজের ফাঁক দিয়ে বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন দেখে তো আনন্দে পাগলপারা! বোধ হয় ঠাওরাল আমি ধর্মনিষ্ঠ রোম্যান ক্যাথলিক।

আমি বললাম, 'আমি ফরাসী জানি না।' হো-হো ক'রে হেসে 'মঁ ভিয়্য' মার্কা লোকটা ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো—

'আমরা কে জানো?'

আমি মনে মনে বললাম, 'জানি, আমার যমদূত। অ্যাডমিরাল দারলঁর চর, আমাকে জার্মানদের কাছে ধরিয়ে দেবে, নচেৎ নিজেরাই আমার ওপর কুকুর লেলিয়ে দিয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করবে।' প্রকাশ্যে ন্যাকা সেজে বললাম, 'জানি না তো।'

মঁ ভিয়্য বললে, 'এই দেখ আমাদের চিহ্ন, জান্—অর্লেঅঁর মেয়ে জোন অব আর্কের ক্রুশ—চিনতে পারছ না? আমরা স্বাধীন ফ্রান্সের জেনারাল লাক্লেয়ারের লোক, মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াই, মৌকা পেলেই জার্মানদের উত্যক্ত করি'।''

আমি বললাম, ''ক্যাপ্টেন ফ্রেডি, আমাদের ডাক্তার বু-ও ঐ রকম

একটা স্বাধীন সৈন্যদলের একজন নেতা। ও'দেরও হাত নিশপিশ্ করছে জাপানীদের একেবারে ছারখার ক'রে দেবার জন্য, শুধু উদ্যোগ সম্পূর্ণ হলেই হ'ল।"

ফ্রেডি বললে "বলো কি হে! তবে আমি একা শুধু শুধু ব'কে মরছি কেন, এইবার আপনি গল্প শুরু করুন ডাক্তার-বু। আপনার ভাঁড়ারে নিশ্চয়ই রোমহর্ষক রোমহর্ষক গল্প থাকবে।"

বু-র গলা থেকে একটা অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ বেরোলো, সেটার অর্থ ধরা গেল না।

আমি বললাম, "যথাসময়ে। আপনি আপনার গল্প শেষ করুন।"

ফ্রেডি বললে, "আমার গল্প তো হয়ে গেল। আমি বেঁচে গেলাম। কিন্তু জর্জ? মঁ ভিয়্যকে বললাম জর্জের কথা। সে আশঙ্কিত হয়ে বলল, 'কাল রাত্তিরে বেরিয়েছে আর আজ দুপুরেও ফেরেনি? কোথায় গেল? কোন্ দিকে গিয়েছিল বলতে পারো?'

আমি বললাম, সোজা ধ্রুবতারামুখো—সমুদ্রে পেঁছিবার পথ খুঁজে বার করতে।'

মঁ ভিয়্য মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে বলল, 'সর্বনাশ! উত্তরে? উত্তরে যে কাভারার চোরাবালি!'

শুনে আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। কাভারার ডাইনী বুড়ি যে কত পর্যটককে সোজা পথে সমুদ্রসৈকতে পেঁছে দেবার ছলনা ক'রে বালিতে জ্যান্ত গোর দিয়েছে তা তো জর্জেরই মুখে শুনেছি। এবারে সে জর্জকেই নিল!

সারাদিন কেটে গেল। বুঝলাম, জর্জ আমাদের চিরতরে ছেড়ে চলে গেছে। সন্ধ্যেবেলা ছোট্ট একটি ক্রুশ বালিতে পুঁতে, জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে চললাম মঁ ভিয়্যদের উটে চেপে সুদানমুখো।

আমার কথাটি ফুরোলো। এবারে ওঝা ডেকে শোনা যাক জর্জের প্রেতাত্মার কী বক্তব্য।"

বু নির্বাক, পাথরের মত নিশ্চল। কী ভাবছে? মাথায় কি জাপানীদের বিরুদ্ধে কোনো নতুন চক্রান্তের ঘূর্ণি চলছে? দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ার জাপানী সেনাধিনায়ক ইমামুরা। সাবধান! তোমার অপসরণ আসন্ন।

মেজর বললেন, "ফ্রেডির আরব্যোপন্যাসের পর আমার সাদা-সিধে সত্যিকথা বড্ড নীরস শোনাবে। তবু বলছি, যাতে পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা ফ্রেডির গল্পের চোরাবালিতে প'ড়ে বেঘোরে প্রাণ না হারান।

সোজা উত্তরেই যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু পথে বাধা পড়ল। দেখলাম একটি উট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুয়ে প'ড়ে ভালো ক'রে নজর করলাম—দু'জন মরুবাসীও তার সঙ্গে আছে, পূব-মুখো হয়ে নামাজ পড়ছে। মরুবাসীদের নামাজ শেষ হতেই আমি মিলিটারীতে-শেখা আরবী ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলাম ঃ

"রক্ষা কর! আমি তৃষ্ণার্ত—জল দাও!"

লোক দু'টি তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি হাত তুলে দেখালাম আমি নিরস্ত্র। একজন আমার মুখে জল দিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আন্দাজে ভর ক'রে বললাম, "আমি ইংরেজ। নিরাশ্রয়।"

তারপরেই লাগল হাঙ্গামা। আমার আরবীও তারা বোঝে না, তাদের ভাষাও আমি বুঝতে পারি না। ভাবভঙ্গীতে বুঝলাম তারা আমাকে উটে চড়িয়ে পূর্বদিকে নিয়ে যেতে চায়। আমিও অগত্যা নানা ভঙ্গী ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলাম পূর্বদিকে জার্মান, দুশমন, দক্ষিণে ওয়েসিসে চলো, যেখানে ফ্রেডি। শেষটায় ওরা রেগে-মেগে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে সেই পূবমুখোই চলল।

ভোর রাত্তিরে ওরা এসে পেঁছিলো বেশ ভালো একটা ওয়েসিসে। আট-দশটা উট, পনরো-কুড়িখানা তাঁবুও সেখানে রয়েছে দেখলাম—ওদেরই আপনার লোকের আড্ডা। আমাকে দু'টি খাইয়ে-দাইয়ে ওরা রেখে দিল একটা ছোট্ট তাঁবুতে। আমি কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকেলবেলায় একটা লোক এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বাঁধন খুলে ওদের সর্দার শেখ গোছের একটা লোকের কাছে নিয়ে গেল।

সর্দার অমায়িক লোক, ফরাসী বেশ বলে, ইংরাজীও দু'-চার

কথা বলতে পারে। জাতিতে তুয়ারেগ। তাকে আমি সমস্ত খুলে বললাম, বিশেষ ফ্রেডির দুর্দশার কথা। সে তখন উটওয়ালাদের বিধিমতে ব'কে দিয়ে সেই সন্ধ্যেয়ই আমাকে পাঠিয়ে দিল ফ্রেডিকে নিয়ে আসতে।

ওয়েসিসে পেঁছে দেখি ফ্রেডি অন্তর্ধান। তাড়াতাড়ি চারদিকে খানাতল্লাসী ক'রে দেখি এক কাঁড়ি সদ্য-খাওয়া খেজুরের বিচী। বুঝলাম আমি চলে যাওয়ার পর ওখানে অভ্যাগতের আবির্ভাব হয়েছিল। তারপরেই নজরে পড়লো একটা পোঁতা ক্রুশ—আগে তো দেখিনি! তবে কি ফ্রেডি?—আর চোখের জল আটকে রাখতে পারলাম না। বেচারী ফ্রেডি! কি অগাধ বিশ্বাস ছিল তার আমার ওপর, আমার এক কথায় জার্মানদের বেড়াজাল এড়িয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল মরুভূমির বুকে। সে বিশ্বাসের মান রাখতে পারলাম না! তেষ্টায় ওর বুকের ছাতি ফেটে গেল। মরণের আগের মুহূর্তে ওর কি মনে হয়েছিল কখনো জানতে পারবো না। শেষ অবধি হয়তো আমার নাম ধ'রে চীৎকার ক'রে ডেকেছিল, ভেবেছিল আমি আসব, ওকে বাঁচাব। কিন্তু আমি এলাম না, নিরাশ হয়ে ও মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়ল—ওঃ!

যারা ওখানে এসেছিল তারা নিশ্চয়ই বেদুইন—ধর্মপ্রাণ, ফ্রেডিকে খৃস্টধর্মমতে গোর দিয়ে গেছে। কি উদারচেতা ওরা, আমার মন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। আহা, বেচারীর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্নের উলকি দেখে ওরা হয়ত ভেবেছিল ফ্রেডি ধর্ম বলতে অজ্ঞান। নতজানু হয়ে ফ্রেডির আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করলাম—আর সেই সঙ্গে আমার গোঁয়ার্তুমির জন্য ক্ষমাও চাইলাম।''

গল্প শেষ ক'রে মেজর হা-হা ক'রে হাসতে লাগল। আমিও যোগ দিলাম। ফ্রেডির গোমড়ামুখে অবশ্য কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না, আর বু-র ললাটে চিন্তারাশি যেন আরও ঘনিয়ে উঠল। আমি বললাম—

''অবাক কান্ড, এত সব ঘটনার পর আপনাদের প্রথম দেখা

হ'ল ক্যাপ্টেন ফ্রেডি, কিন্তু আপনার মনে যে আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল তা তো মুখ দেখে মনে হচ্ছে না।''

ফ্রেডি বললে, ''ভায়া, একাজে নতুন নেবেছ, দু'-চারদিন যাক্, আনন্দ কর্পূরের মত উবে যাবে। ফ্রেডির হাতেখড়ি হয়েছে '৩৫ সালে, হাব্শী-ইতালীয় যুদ্ধে—ঐখানেই জর্জের সঙ্গে আলাপ। সে পালা সাঙ্গ হ'তে না হ'তে লেগে গেল স্পেনে, আমরা দু'জনেই জড়িয়ে পড়লাম। সেখান থেকে জবরদস্তি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল দেশে, অমনি শুরু হ'ল কুচকাওয়াজ আর আরেক যুদ্ধের পাঁয়তারা। একটা তো দেহ, কত আর বয় বলো।

তারপর লাগলো এই যুদ্ধ—নার্ভিক, ডানকার্ক, ব্যাটল্ অব্ ব্রিটেন, উত্তর আফ্রিকা—সব ঘুরে এলাম এখন আরাকানে। সাত-সাতটি বছর যমদূতকে ফাঁকি দিয়েছি। কিন্তু এবারে খেল্ খতম—অব্যর্থ। এতদিন শত্রুর নজর এড়িয়ে বেঁচেছি, কিন্তু এবারে বন্ধুর দয়ায় মৃত্যুযোগ—আর রক্ষে নেই।''

আমি বললাম—''সে কি?''

''হ্যাঁ হে। আমি তো এই রাথেডাউং ফ্রণ্ট থেকে আসছি—পরশু দিনের ঘটনা। সবিশেষ বলছি শোনো। ও ফ্রণ্টটা একদম ব'সে গিয়েছিল, নড়ন-চড়ন কিচ্ছু হচ্ছিল না। আমরা বলাবলি করতাম, আর কিছুদিন গেলেই ফ্রণ্টটার ওপর আমাদের দখলী স্বত্ব এসে যাবে, নাতি-পুতিকে উইল ক'রে দিয়ে যাব। কি বাহারের সব নাম ডেরাগুলোর, দেখবে গেলে পর। একখানা শেয়ালের গর্ত, সেখানে এক কর্পোরালের বাস, নাম 'মাল্‌মেজ'', আরেকটি গর্তে এক কামানদাগ থাকে, নাম 'সুইট্ হোম'; একটি গুহায় দু'জন বাঙালী সিগন্যালর থাকে—গুহার দুটো মুখ, তার নাম 'হাজার-দুয়ারী'। এক নজরেই বোঝা যায় সবারই নিজ নিজ বাসার উপর বেশ মায়া পড়ে গেছে।

হঠাৎ এক বেরসিক জেনারাল হুকুম দিল—এগোতে হবে, যেন তেন প্রকারণে। এগোনোর ইচ্ছে আমাদেরও ছিল অল্প-বিস্তর কিন্তু পথে একটা মারাত্মক বাধা ৫২নং পাহাড়, সেখানে জাপানীরা বন্দুক উঁচিয়ে ব'সে আছে, যেতে দেয় না। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ওপরে

দরবার করল—ঝটিতি ৫২নং পাহাড়ের ওপর একদফা হাওয়াই হামলা ক'রে ওখান থেকে জাপানীদের সরিয়ে দাও, ঝড়ের মত আমরা এগোব। একদিন গেল, দু'দিন গেল, কা কস্য পরিবেদনা, কোথায় হাওয়াই হামলা? কোনো প্লেনই সে-তল্লাটে এলো না। কমাণ্ডার চটে-মটে ওপরে খবর দিল—থাক, আর কারো সাহায্য দরকার নেই, আমরা নিজেরাই কাজ চালিয়ে নেব।

কমাণ্ডারের হুকুমে পরশুদিন ভোর চারটেয় আমাদের আক্রমণ শুরু হ'ল। সর্বজীৎ সিং কল্‌হার প্লাটুন জাপানী মেশিনগানের গুলীর স্রোত অগ্রাহ্য ক'রে সোজাসুজি ৫২নং পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করল—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! জাপানীরা বুঝলে এ কাঠ-গোঁয়ারের জাত, দিনের আলোয় এদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়া মূর্খামি; বুদ্ধিমানের মত তারা ভোরের কুয়াশা না কাটতেই পাহাড় থেকে সরে পড়ল। বাঁ দিক থেকে এক প্ল্যাটুন রাজপুতানা রাইফলস্ আর ডান দিক থেকে এক প্ল্যাটুন ল্যাঙ্কাশিয়ার ফিউজিলীয়ার্স'ও একটু পরেই গিয়ে পাহাড়ে জড়ো হ'ল।

এই ঘটনার ঝাড়া দু' ঘণ্টা বাদে সাঁ-সাঁ ক'রে দু'খানা উড়ো-জাহাজ এসে ৫২নং পাহাড়ের ওপর পর পর তিন প্রস্থ গুলী চালিয়ে চলে গেল। জাপানী বিমান? না। আমাদেরই আর, এ ,এফ, ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনী!! ল্যাঙ্কাশিয়ার ফিউজিলীয়ার্স'রা প্রাণপণে ঝাণ্ডা নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করল সেম্-সাইডে গুলী চলছে; বিমানের গোলন্দাজ গ্রাহ্যও করল না, হয়তো ভাবল ধূর্ত জাপানীরা ধোঁকা দিচ্ছে। গুলী লেগে চোদ্দটি লোক মারা গেছে—এই তো তাদের গোর দিয়ে আসছি। ভেবে দেখ, সরাসরি আক্রমণে জাপানী গুলী খেয়ে সর্বজীৎ সিং হারালো সবশুদ্ধ ছ'টি লোক, আর অকারণে ব্রিটিশ 'সাহায্য' পেয়ে মারা গেল চৌদ্দটি। তাই বলছিলাম ফ্রণ্ট-লাইনে গিয়ে আর সুখ নেই, এখন ফ্রণ্ট-লাইনে যাওয়া মানে সুইসাইড, আত্মহত্যা।"

ফ্রেডির কথা শুনে হাসব কি কাঁদব বুঝতে না পেরে মেজরের মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম মেজরের মুখ অসম্ভব কাঁদো-কাঁদো। ৫২নং পাহাড়ের দুর্ঘটনায় এই খোশ-মেজাজের লোকটি এতই

বিচলিত হয়ে পড়লেন? কিন্তু কিসের দিকে চেয়ে আছেন তিনি একদৃষ্টে? সে দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে আমার চোখ পড়ল বু-র পাত্রের উপর। বু-র প্লেটে স্তূপীকৃত নানু-কাবাব অর্ধ-অভুক্ত। বু-র আসন শূন্য।

মেজর গলা খাটো ক'রে বললেন, "কী হলো?"

আমি বললাম, "সারাদিনের ক্লান্তি, মেসের বে-বন্দোবস্তি, কত কি হতে পারে।"

ফ্রেডি বলল, "কী বলছ তোমরা?"

আমি বুঝিয়ে বললাম, "কিছু নয়। আমাদের ডাক্তার বু আদ্ধেক খেয়ে উঠে গেলেন কী নিমিত্ত তাই শুধু ভাবছি।"

ফ্রেডি বললে, "আদ্ধেক! প্লেটে যে-পরিমাণ পড়ে রয়েছে, সেই পরিমাণ লোকটা গিলেছে?"

মেজর বললে, "হ্যাঁ হে, বরং তার বেশী। কিন্তু তুমি তো ওকে জানো না, ও খাবার ওর জলখাবার। ওতে ওর কিছুই হয়নি। আমার মনে হয়, ফ্রেডির রাক্ষুসে গল্পগুলো শুনেই বেচারী দমে গেছে—"

আমি আপত্তি ক'রে বললাম, "সে কী ক'রে হবে? লোকটা এত বছর ধ'রে লড়াই ক'রে আসছে কোরিয়ার স্বাধীনতার জন্য, সামান্য একটু গল্প শুনে টেঁশে যাবে? তা নয়, হয়তো ঘুম পেয়েছিল, আড্ডা না ভাঙে সেই ভয়ে চুপি চুপি চলে গেছে।"

মেজর ভয়ে ভয়ে ইংরেজীতে যা বললেন তার বাংলা হচ্ছে—

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

বু-র বাসায় গিয়ে দেখি, সে উবুড় হয়ে বিছানার উপর শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে ডাকলাম।

বু সাড়া দিল না।

আমি আবার ডাকলাম, কুশল শুধালাম। বু ক্ষীণস্বরে জবাব দিলে, "পেটটা বড্ড কামড়াচ্ছে।"

"এম্. ও.-কে ডাকবো?"

বনু বললে, "না না না, মেডিক্যাল অফিসার কী জানে? যত সব ঘোড়ার ডাক্তার—ওরা যা ওষুধ দেবে তা আমার কাছেই আছে, নিউ ইয়র্ক থেকে এক সেট কিনে এনেছি। না না, আমার মনে হচ্ছে, গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে, অবিলম্বে ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে।"

"একবার মেজরের সঙ্গে আলাপ করি?"

"না না, যে গোঁয়ারগোবিন্দ লোক, হয়তো বলবে 'খানিকটা দৌড় ছুট ক'রে সমুদ্র-স্নান ক'রে নাও, সব সেরে যাবে', নয় বলবে 'সব মনের বিকার, মনে করো তুমি সুস্থ, তুমি সুস্থতর, তুমি সুস্থতম, অসুখ নিমেষে মিলিয়ে যাবে।' তুমি বরং তাড়াতাড়ি আমার কলকাতা ফিরে যাবার জন্য একটা প্লেনের বন্দোবস্ত করো।"

আমি হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, "ডাক্তার বনু, খাওয়ার সময় তুমি জল খেয়েছ?"

বনু ব্যস্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ খেয়েছি, কেন বলো তো?"

"সর্বনাশ! কক্সবাজারের জলে যে সীসে থাকে! চারদিকে সীসের খনি, ছোঁয়াচ লেগে জলেও সীসে এসে যায়।"

বনু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আমি ছুটলাম ওষুধ আনতে।

যদি কক্সবাজার অঞ্চলে প্রচুর সীসের খনি থাকত, আর তার ছোঁয়ায় কক্সবাজারের পাহাড়ে-নদীর জল সত্যিই বিষাক্ত হ'ত, আর মেসের অক্সাইড, পারম্যাঙ্গানেট মেশানো ফিল্টারে চোঁয়ানো জল ফুটিয়ে নিলেও তার দোষ না যেত—তা'হলে বিচক্ষণ ডাক্তার যে কী ওষুধ দিত তা জানি না। আমি বনু-কে দিলাম এক পেয়ালা গরম দুধ এবং দু'টি ঘুমের ওষুধের বড়ি। তারপর তাকে শুইয়ে দিয়ে মাথায় কয়েক মিনিট বাতাস করতেই বনু ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত তিনটে থেকেই আবার যাত্রার আয়োজন শুরু হ'ল। ভোর চারটের মধ্যে রওনা দিতে হবে। সারিবরান্দ মোড়চামুখো সৈন্য-বাহী গাড়ী দিনের আলোয় জাপানী বিমানের নজরে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা। তাই দিন হবার আগেই রাস্তা পেরোতে হবে। তাছাড়া

পথে আবার একটা নদী পেরোনোর পর্ব আছে। ফেরি স্টীমারে সবার জায়গা ধরবে না, যারা আগে যাবে তারাই আজই পেরিয়ে যাবে যারা শেষের দিকে থাকবে তাদের এক রাতের মত নদীর ধারে ধারে তাঁবু গাড়তে হবে। সেটা কারো পছন্দ নয়।

আমরা চটপট সেরে নিলাম, কিন্তু বিপদ হ'ল বু-কে নিয়ে। একবার বলে সে পাসপোর্ট খুঁজে পাচ্ছে না—বোধ হয় কলকাতার মেসে ফেলে এসেছে, এখুনি ফিরে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, একবার বলে পরশুদিন কলকাতায় তার কাছে মাণ্ডুকুও থেকে লোক আসবে গত ছ'মাসের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আগামী ছ'মাসের কাজের হুকুম নিতে—বু না থাকলে সে মহা বিপদে পড়বে, কারণ সে শুধু কোরীয় ভাষা জানে আর কিচ্ছু জানে না। ব্রিটিশ মিলিটারী তাকে হয়তো জাপানী গুপ্তচর মনে ক'রে গুলী ক'রে ফেলবে।

যে-সমস্যাই বু তোলে, মেজর নিমেষে তার সমাধান ক'রে দেয়।

আমাদের ইউনিটের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আছে, দিনে দুবার খবর দেওয়া নেওয়া হয়। অবিলম্বে বু-র হারানো পাসপোর্টের খবর, মাণ্ডুকুওর লোকের খবর, কলকাতায় পেঁছে দেওয়া যেতে পারে, উচিত ব্যবস্থা যাতে হয়। আর বু-র শূলব্যথাটাও মেডিক্যাল অফিসারকে দেখিয়ে নিতে হবে। না দেখালে কোর্-হেড কোয়ার্টার্স'ও প্লেনের হুকুমনামা সই করতে রাজী হবে না।

বু-কে রওনাই হতে হ'ল শেষ পর্যন্ত, শুধু দেরীর দরুণ সারির গোড়ার দিককার গাড়ীগুলো অন্য অন্য ইউনিট নিয়ে ফেলল, আমরা পড়লাম শেষের দিকে। একেবারেই শেষে জায়গা হ'ত আমাদের, যদি আর একটি ইউনিটের একটু অভিনব রকমের দুর্বিপাক না ঘটত। তাদের একটি সার্জেণ্টকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সারা ক্যাম্প গোরুখোঁজা ক'রেও তাকে না পেয়ে অফিসার তাদের রওনা দেবার হুকুম দিচ্ছিলেন এমন সময় কয়েকটি ভয়ে জড়সড় গোরা তাঁর কাছে এসে নিবেদন করলে যে সার্জেণ্টকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু যেন বহু দূর থেকে তার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কখনো মনে হয় আওয়াজ এদিকে কখনো ওদিকে। তারই

ঘ

গলার আওয়াজ, নিঃসন্দেহে, ইউনিটের লোকদের নাম ধরে ধরে ডাকছে।

লেফটেন্যাণ্ট গট গট ক'রে তদন্ত করতে গেলেন। কিন্তু পথে তাঁর অন্য একটি বিষয়ের দিকে নজর পড়ে গেল—একটি ট্রাক বড্ড বেশী বোঝাই করা হয়েছে। তখুনি তিনি হুকুম দিলেন ভার আল্‌গা করতে। তেরপলের ঢাকনার বাঁধাই ছাঁদাই খুলে দু'চারটি মাল নামাতেই গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ শোনা গেল মালের তলা থেকে। ঝটপট সে মাল হাবিজ করতেই বেরোলো সার্জেণ্টের অর্ধমৃত দেহ।

সার্জেণ্টের দেহ হাসপাতালে জমা দেওয়া হ'ল। জ্ঞান হতেই সে চিঁ চিঁ ক'রে বলল যে, রাত্রে অত্যধিক বীয়ার টেনে অবসন্ন হয়ে সে ট্রাকের মধ্যেই শুয়ে পড়েছিল। যখন তার ঘুম এবং নেশা ভাঙল তার মনে হ'ল সে নরকের অন্ধকূপে, কতকগুলো অদৃশ্য যমদূত তার ওপর বসে তাকে কষে চেপে ধরে রয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল যে, এত ঘোর পাপী সে, সেই বিষম মুহূর্তেও তার ঈশ্বরের নাম স্মরণে এলো না, সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে সেই পাপিষ্ঠ-দেরই নাম ধরে ডাকছিল যারা গত রাত্রে নিজ নিজ অংশের বীয়ার থেকে এক এক পাত্র খাইয়ে তাকে অতি পানের মহাপাতকের পথে প্ররোচিত করেছে।

ইউনিটের পাপিষ্ঠরা শুকনো মুখে এজেহার দিল, আধঘুমন্ত অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে তারা মালভ্রমে সার্জেণ্টের দেহের উপর আরো মাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ট্রাক ভর্তি ক'রে মাল তেরপলবন্দী করেছিল। শব্দটি যে ট্রাক থেকেই আসছিল তা কখনো মনে হয়নি, মনে হয়েছিল যেন কোন দূর থেকে আসছে।

বিরক্ত মুখে লেফটেন্যাণ্ট তাড়াতাড়ি তার লোক, মাল ট্রাকবন্দী ক'রে সারিতে এসে দাঁড়াল সবশেষে, আমাদেরও পিছনে। তারপর সবাই রওনা হলাম স্ব স্ব দেব-দেবতা পীর-ফকীরের নাম ক'রে।

উখিয়া অবধি নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। তারপর গাড়ীর সারি

সবে পাহাড়ে চড়তে শুরু করেছে, এমন সময় ত্বরিত হুকুম এল—নামো সব গাড়ী থেকে! মুখে মুখে জানা গেল চট্টগ্রাম থেকে খবর এসেছে এক ঝাঁক জাপানী প্লেন সেখানে হানা দিয়েছে, ফেরতা পথে হয়তো আমাদের উপর তাদের কৃপাদৃষ্টি পড়তে পারে। অতএব গাড়ীগুলো আপাতত জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে বাকী পথটা পায়ে হেঁটে চলতে হবে—একটু সাবধানে।

বু-র শূল ব্যথার ভয়ে তার ঝোলাটোলাগুলো এর ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। খালি হাতেই সে চলল, আমার পাশে পাশে। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, স্টীমারে তার মুখের যে কমনীয় শুভ্রতা লক্ষ্য করেছিলাম, অযত্নে সেটায় একটু দাগ ধরে গেছে। চুলের পাটও ঠিক আর তেমনটা নেই। ডাইংক্লীনিং-এ কাপড়ের যে-রকম জলুস খোলে সৈন্যদের ক্যাম্পের ধোপা সে রকমটি আনতে পারে না, তাই কাপড়-চোপড়ও পরিধায়ীর মত ঈষৎ ম্লান।

গজর গজর করতে করতে চলল বু। "গোঁয়ারতুমি তো নয়, নিছক গুণ্ডামি। এত কাজ পড়ে রয়েছে আমার, সে সব ছেড়ে চলে এলাম, তাও প্লেনে নয়, লক্কড় এক ট্রেনে, স্টীমারে, ঝড়ঝড়ে ট্রাকে এবং এখন ট্যাঙস ট্যাঙস ক'রে হেঁটে। বাজে সময় নষ্ট। পই পই ক'রে বললাম ব্রিগেডীয়ারকে 'আমার কি কোথাও দু দণ্ড দাঁড়াবার জো আছে? আমি অন্য লোক দিচ্ছি, আমারই তাঁবের, তাদের দিয়ে তোমাদের কাজ সেরে নাও।' ব্রিগেডীয়ার ধরে পড়ল 'তুমি শুধু একবারটি কাজটা চালু ক'রে দিয়ে যাও!' আমি যদি জানতাম এই রকম বন্দোবস্ত, আমি কি এ পথে পাও এগোই!"

অনেকটা পথ বাকী; গজর গজর করলে পথ ফুরোবে না। লালমাটির পথ, পাহাড়ে, দুধারে ঘন জঙ্গল। প্রাচীন আরাকান রোড। এই পথ দিয়েই শাহ্‌জহানের ছেলে শুজা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। সে গল্প বু-র কাছে ফলাও ক'রে ফেঁদে শুধু শুধু হয়রান হলাম। তার নিজের বর্তমান দুর্দশায় সে এত অভিভূত যে সুদূর অতীতের শুজার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করবার মত তার অবস্থা ছিল না।

কতকগলো ব্রিটিশ ছোঁড়া রঙ্গ ক'রে জার্মান সৈনিকদের

পেয়ারের গান 'লিলি মারলেন' গাইতে গাইতে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। আমি বু-কে জিজ্ঞেস করলাম,

"ডাক্তার, তোমাদের কোরীয় বিপ্লবীদের কোনো জাতীয় সঙ্গীত আছে?"

বু-র বুকখানা ফুলে বিশহাত হয়ে গেল। বলল,

"আলবৎ!"

আমি বললাম, "খাঁটি কোরীয় ভাষায়? না 'ইনটার-ন্যাশন্যালের' মত অন্য ভাষায় তৈরী গান কোরীয় ভাষায় তরজমা করা?"

বু বললে, "ধ্যেৎ ইণ্টারন্যাশন্যাল-এর কোরীয় তরজমা শুধু কোরীয় কম্যুনিস্টেরা গায়। আমরা গাই খাঁটি কোরীয় গান, কোরীয় কবির লেখা, কোরীয় গাইয়ের সুর দেওয়া।"

বু গুন গন ক'রে গাইল ঃ

"হাঙ্গি পারারে! হিম্ ইৎকে মুংছ!

ইয়ঙ্গামি নাগা!

আংমা গাখান উরে বুন্সু ছামুল্লিছিজা!"

আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, "তোফা! জোরে গাও! আমি কিচ্ছু বুঝি না, আমারই গান শুনে ইচ্ছে করছে ব্যাটাদের ধরে আচ্ছা ক'রে ছামুল্লিছিজা ক'রে দিই, আর তোমাদের কী রকম বুক ধড়ফড় করে বলো তো! গাও দাদা, গর্জে গাও!"

দ্বিতীয় কলি চলল ঃ

"উরে তীরিন্ সাম ছন্দমানে
তাজুং আপ্হে সু হিম্ ইৎকে
কুৎকো ইন্জেন সন্বং ইদা!"

আমি বললাম "ওঃ, এতো গান নয় এ যে ঘটোৎকচের সিংহনাদ! রক্ত গরম হয়ে উঠছে, নিজেকে আর সামলাতে পারছি না। কুৎকো ইন্জেন মানে কী—কোঁৎকা পেটান? বহুৎ আচ্ছা, বাবা জাপানী, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। দুটো চারটে ব্রিটিশ আর আমেরিকান ঠেঙিয়ে মনে করেছ কী বা হনু রে, এইবার কোরীয় কোঁৎকা খেয়ে বানরঃ কীলকৈঃ যথা দশাপ্রাপ্ত হও।"

বন্ন সলজ্জভাবে বলল, "না 'কুৎকো ইন্‌জেন' মানে 'চলন্ত সম্মুখ'। গানটা বেশ, কী বল?"

আমি বললাম "বেশ? বেশ মানে? বিস্ফোরক! এই গান জাপানী ফ্রন্টকে শুধু গেয়ে শোনালেও ওদের ফ্রন্ট ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। 'কুৎকো ইন্‌জেন'—অ্যাঁ? 'আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে' উদ্দাম চলেছে কুৎকো ইন্‌জেন আরাকান-বর্মা হাতে এসে গেল, তবু কুৎকো ইন্‌জেন মালয়-শ্যাম-কম্বোজ-ইন্দোচীন—থামবে না কুৎকো ইন্‌জেন—চলন্ত সমুখ। যতদিন কোরীয়া থেকে শেষ জাপানী সৈন্য বিতাড়িত না হয়, ইঞ্জিন চলবে. চলবে, শান্ত হবে না।"

বন্ন স্বাধীন কোরীয়ার উচ্চশিখর থেকে কৃপাভরে আমার দিকে চেয়ে বলল, "তোমাদের কী হবে? ইন্ডিয়া স্বাধীন হবে?"

পিছন থেকে জবাব এল "তাও হবে।" ফিরে দেখি মেজরটা এসে জুটেছে। বললে—

"ইন্ডিয়ার ভেতরের খবর আমার জানা নেই, শুধু এইটুকু বুঝেছি যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের দরদী বন্ধু ভারতীয়দের মধ্যে নেই। যারা মুখে বলে দরদী তাদেরও বিশ্বেস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তাছাড়া আরও দুটো কারণে ব্রিটেন ভারত ছাড়তে বাধ্য হবে। একটি কারণ আমেরিকান শিল্পের অদ্ভুত কর্মতৎপরতা, আর একটি সোভিয়েট রাজনীতির দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তি। যুদ্ধের 'পর এ দুয়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় ব্রিটেনের এত শক্তিক্ষয় হবে যে জবরদস্তি ভারতের ওপর দখল রাখা তার ক্ষমতায় কুলোবে না।"

বন্ন কী একটা বলতে যাচ্ছিল আমি তাড়াতাড়ি বললাম,

"ভবিতব্যের লিখন কে খন্ডাবে? জন্মিলে মরিতে হবে মরিলে জনম। ব্রিটিশ শাহান্‌শাহী পয়দা যখন হয়েছে ফৌতও অবশ্য হবে। কিন্তু আপাতত কুৎকো ইন্‌জেন।"

মেজর বলল, "সে কী জিনিস?"

আমি বললাম, "শোনো একবার জাপান বিধ্বংসী কোরীয় গান। গাও বন্ন-দা, এক প্রস্থ গেয়ে জাপানীদের পিলে চমকে দাও।"

ফিরে ফিরে চার দফা গাওয়ার পর মেজর আর আমিও গানে

যোগ দিলাম, আশেপাশে আরও দু'চারজন ছিল তারাও যোগ দিল। মার্চের গান, তালে তালে পা ফেলে আমরা তীরের বেগে এগোতে লাগলাম। যে ব্রিটিশ ছোঁড়াগুলো লিলি মার্লেন গাইতে গাইতে আমাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবার আমরা তাদের ছাড়িয়ে চললাম। হাঙ্গি পারারের ধমকে তাদের গান কেঁউমেউ ক'রে থেমে গেল, আর জমল না। আমরা চেঁচিয়ে বললাম, "শিখে নাও এ মারাত্মক গান নইলে আমরা যখন রেঙ্গুন পোঁছে যাবো তোমরা তখনও পড়ে থাকবে টেক্‌নাফে। বলো ভাই—হাং গি পা রা আ রে হিম্‌ ইংকে মুং ছু অ!"

স্টীমার ঘাটে যখন পোঁছলাম বুর মুখ তখন আনন্দে উদ্ভাসিত। অন্তত পঞ্চাশজন সৈন্যের তখন হাঙ্গি পারারে কণ্ঠস্থ। মেজর বললে, "ডাক্তার বু, এবারে আমাদের একদফা মানেটা বুঝিয়ে দাও!"

বু বললে, "সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হবে—জাতীয় সঙ্গীত যে!"

সবাই উঠে দাঁড়ানোর পর বু বোঝালো,

"একই পতাকা তলে, ভীমবলে এক হও!
বীরদর্পে যাও!
পাপপ্রায় আমাদের শত্রু ধ্বংস করো!
আমাদের পক্ষে তিন কোটি
লোকবল সুসংহত, ভীমবেগে
চলন্ত সম্মুখে আমরা।"

স্টীমারে উৎকৃষ্ট প্রাতরাশ সমাধার পর মেজর লাউড স্পীকার-গুলো কোথায় কী অবস্থায় আছে দেখতে চলে গেল। বু ডেকের উপর থেকে নির্বিকার মুখে ডাঙায় সৈন্যদের কার্যকলাপ দেখতে লাগল, কতকটা সেইভাবে যেভাবে বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা জাতীয়

দিবসে দেশীয় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখেন। সৈন্যদের দু একজন তখনও গাইছে 'হাঙ্গি পারারে'।

হঠাৎ বনু-র নজরে পড়ল ডেকের ঠিক মধ্যিখানে—একটি ব্রেন গান। কাছে গিয়ে নাড়াচাড়া করা আরম্ভ হ'ল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এ বন্দুকটা এখানে কেন বলতে পারো?'

আমি জবাব দিলাম, "বোধ হয় ওপারে নিয়ে যাবার জন্য!"

বনু বললে, "উঁহু। শক্ত ক'রে আঁটা—ওপারের জন্য নয়, এই জাহাজেরই বন্দুক। ওর চোঙটাও আকাশের দিকে তাগ করা। খবর নাও তো এর কী ব্যবহার।"

আমার খবর নিতে হ'ল না। স্টীমারের কর্তা ছোকরা লেফটেনাণ্টটি কাছেই ছিল, তড়বড় ক'রে এসে খবর সরবরাহ শুরু ক'রে দিলে, "ওটা? ওটা ব্রেনগান—এ স্টীমারে বিমানধ্বংসী কামান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।"

বনু চমকে উঠে বলল, "বিমানধ্বংসী? এখানে জাপানী প্লেন আসে নাকি?"

লেফটেনাণ্ট বলল, "আসে বৈকি, রোজ আসে—কখনো দিনে দু'তিনবার। এই তো ইণ্ডিয়ার শেষ—নদীর ওপারে বর্মা, জাপানের দখলে।"

আমি বললাম, "অবশ্য এ স্টীমারের কাছাকাছি আসতে পারে না—এলেই বন্দুকের গুলীতে পপাত ধরণীতলে।" ব'লে লেফ-টেনাণ্টকে চোখ টিপে ইশারা করলাম।

হাঁদাটা কিছু না বুঝে বলল, "জাপানী বৈমানিকেরা অতি সেয়ানা। তারা জানে ব্রেনগানের দৌড় কদ্দুর! ওরা ঠিক ব্রেনের নাগালের বাইরে থেকে ঘুর ঘুর ক'রে তত্ত্ব নেয়। গুলী টুলিও করে—বিশেষ যদি স্টীমারে হাই অফিসর থাকে। সব খবরই পায় তো ওরা!"

বনু-র মুখখানা এক নিমেষে পাঁশুটে হয়ে গেল। বুঝলাম, হাঙ্গি পারারের প্রভাব অন্তর্হিত হলো। বাক্যালাপ না ক'রে বনু সোজা নিজের ক্যাবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। আমি জাহাজের

মূর্খ কর্তাটিকে কয়েকটি চোস্ত মিলিটারী গালাগাল দিয়ে মেজরের কাছে ছুটলাম।

কী যে করা উচিত সেটা কি মেজর কি আমি কেউই ভেবে কিনারা করতে পারলাম না। হয়তো হ'তও না কোনো কিনারা, দৈবাৎ খবর এসে গেল স্টীমারের এঞ্জিন বিগড়ে গেছে, সেদিনকার মত যাত্রা স্থগিত। আমি বু-কে খবরটা জানালাম। খবরে বোধ হয় বু-র বুকে আশার সঞ্চার হ'ল। ক্যাবিনের দরজা খুলল, নাওয়া খাওয়াও সারা হ'ল। সেই সুযোগে লেফটেনাণ্ট এসে—ঝাড়া মিথ্যে কথা বলেছিল ব'লে ক্ষমা চেয়ে নিল। সে বলল, সে কদাচ জাপানী প্লেন চোখে দেখেনি, শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্য গল্পটা করেছিল। ও অঞ্চলে যত বিমান আসে, সব মিত্রশক্তির—জাপানীরা ভয়ে ওখানে আসতেই পারে না। বু হ্যাঁ না কিচ্ছু বলল না।

রাত্রে শুতে যাবার আগে শুনলাম এঞ্জিন ঠিক হয়ে গেছে, কাল ভোররাত্রে স্টীমার রওনা হবে। প্রভূত সতর্কতা সত্ত্বেও কী ক'রে যেন খবরটা বু'র কানে এসে গেল, তার মুখও রাহুগ্রস্ত চাঁদের মত অন্ধকার হয়ে গেল।

ভোর চারটেয় মেজরের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি তার চুল উস্কোখুস্কো, চোখের কোলে কালি। বল্‌ল, "প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, আর পারছি না। সারারাত বু ঘুমতে দেয়নি, বার বার বলে একই কথা—ও ফ্রণ্টে যাবে না, এখুনি কলকাতায় ফিরবে। আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, তুমি যা হোক করো। আর্মিব্রিগেডীয়ারকে সবিস্তারে খবর জানাচ্ছি।"

মেজরের ক্যাবিনে গিয়ে দেখি বু পাগলের মত পাইচারী করছে। আমাকে দেখেই আমার দু'হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,

"বাঁচাও, কোরীয়াকে বাঁচাও। আমি গেলে কোরীয়া রসাতলে যাবে। আমিই চার্চিল-রুজভেল্টকে বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করেছি, যুদ্ধশেষে তারা কোরীয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র ব'লে মানবে। আমি গেলে ওরা প্রতিশ্রুতি রাখবে না। জাপান যদিও হারে, তবু কোরীয়া স্বাধীন হবে না। বাঁচাও বন্ধু আমাকে

বাঁচাও, ওদের অঙ্গীকার ভাঙ্‌তে দিও না। কোরীয়ার ভবিষ্যৎকে বাঁচাও!"

আমি বললাম, "দেখ বু, তুমি একজন নেতা, আমি একজন সামান্য ভারতীয় সৈনিক। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। তবে তোমার কাপুরুষ বদনাম হলে সেটা আমাকেও বাজবে. কারণ তুমি আমি দুজনেই পরাধীন দেশের বাসিন্দা, আর পরাধীন দেশকে বরাবর কাপুরুষ বদনামের খোঁটা সইতে হয়।"

বু বলল, "কে কাপুরুষ? তোমাকে কী বোঝালাম এতদিন? সমস্ত কোরীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সংযোগসূত্র আমার হাতে. আমি যদি মরি সব ছারখার হয়ে যাবে। তাই তো আমি নিজেকে বাঁচাতে চাই. এতে কাপুরুষতা কোথায় হ'ল?"

আমি বললাম, "তুমি যে রোজ রোজ উড়োজাহাজে লণ্ডন-চুংকিং-ওয়াশিংটন ক'রে বেড়াচ্ছ, তাতে তোমার জীবন বিপন্ন হয় না? প্লেন তো হরঘড়ি চুরমার হচ্ছে!"

বু বলল, "ধরো যদি আমি জাপানীদের হাতে ধরা পড়ি, আর ওদের সামরিক পুলিস কেম্‌পেই'র অত্যাচারে সব গুপ্ত খবর ভ্যাড় ভ্যাড় ক'রে ব'লে ফেলি?"

"এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। হাজার হাজার কোরীয় বিপ্লবী ছেলেমেয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে—তাদের নেতা তুমি, তোমার ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস—আর তুমি জাপানী পুলিসের অত্যাচারে তাদের ধরিয়ে দেবে? কিছুতেই পারবে না। ব্যস্‌, আর কোন কথা নয় বু, এখন ঠাণ্ডা হও, ঘুমোও।"

ঠিক ফ্রণ্টে পৌঁছবার আগে তিনদিন আমাদের ইউনিট ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের আড্ডা মাউংডতে রয়ে গেল। কলকাতা থেকে যে সব মালমোটরা বয়ে আনা হয়েছিল তার খানিক মাউংডতে জমা রাখা হ'ল, আর বাকিবাদ যা নিলেই নয় এমন জিনিস শক্ত ক'রে বেঁধে-ছেঁদে নেওয়া গেল। ইউনিটের রান্নাবান্নার ভার নিল বু

এবং 'জ্যাক্' ডাক নামের একটি জাপানী ভাষা বিশেষজ্ঞ ইংরেজ। দেখা গেল দু'জনেরই রান্নায় অসামান্য দক্ষতা।

যদিও মাউংড বর্মায়, স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাষীদের বংশধর। ভাষাও তাদের চাটগেঁয়ে বাঙলা, তবে তাতে কতক বর্মী আর কতক উর্দু ভাষার মিশেল আছে। আমি এক স্থানীয় হেডমাস্টারের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে তিনদিন বাঙলা সাহিত্যচর্চার স্বর্গসুখ অনুভব ক'রে নিলাম।

মেজরের কাছ থেকে বসু-র বিগড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে ব্রিগেডীয়ার সোজা উড়ে এসেছিলেন মাউংডতে। তিনি সবিশেষ শুনে তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি বললেন,

"ডাক্তার বসু, আপনার দলের তিনজন কোরীয় অফিসর কলকাতায় এসে পেঁৗছেচেন। মেজর আমার কাছে যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন. সেটা ভ্রমক্রমে আপনার অফিসরদের কানে পেঁৗছে যায়। তাঁরা শুনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং মেজর মিথ্যাবাদী, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরাও আমার-সঙ্গে আস্তে চেয়েছিলেন, সাক্ষাতে প্রকৃত ঘটনা জান্তে। আমি তাঁদের বুঝিয়ে নিরস্ত করেছি।"

বসু বলল, মেজর ঠিক বুঝতে পারেননি। আমার কলকাতায় কতগুলো কাজ ছিল, তাই ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। কাজগুলো সেরেই চলে আস্তাম।"

"ঠিক এই কথাটাই আমি আপনার অফিসরদের বলেছিলাম যে, মেজর মিথ্যা বলেননি, কোন ভুল বোঝাবুঝির জন্যই ব্যাপারটা ঘটেছে। তা আপনার যে কাজগুলো বাকী ছিল, আপনার অফিসরদের দ্বারা কি সেগুলো সম্পূর্ণ হতে পারে না?"

বসু বললে, "কতক কতক, সবগুলো ওরা পারবে না।"

ব্রিগেডিয়ার বললেন, "তা হলে তাড়াতাড়ি ফ্রণ্টের পর্বটা সেরে নিয়ে ফিরে চলুন। আমিও যাই আপনাদের সঙ্গে। ফেরবার সময় একই সঙ্গে ফেরা যাবে।"

বসু কাঠ হয়ে বলল, "বেশ তো।"

ফ্রণ্ট অঞ্চলটি দিব্বি ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু এমন বরাত, যেদিন আমরা গিয়ে পেঁৗছলাম, দনাদ্দন চারখানা জাপানী শেল পর পর

এসে আমাদের লাইনে ফাটল। দুটো উঁচু টিলার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমরা ''বাসা'' বাঁধার সুচিন্তিত প্ল্যান করছিলাম, এমন সময় কাণ্ডটা ঘটল। প্রথম শেলখানার শিস কানে আসামাত্র জাপানী ভাষার ওস্তাদ জ্যাক বু-কে জড়িয়ে ধরে ঝুপ ক'রে একটি গর্তে লাফিয়ে পড়ল। আমি সটান উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম।

মেজর রেগে বলল, ''কী ছেলেমানুষী করছ? ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরী, পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছ, ভয়টা কিসের?'' আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। গর্তের ভিতর থেকে জ্যাকের আশ্বাসবাণী শোনা গেল,

''কোন ভয় নেই বু। এ ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরী—টেনিসে নীচু ড্রাইভে যেমন বল, হয় নেটে লেগে থেমে যায়, কিংবা শাঁ-শাঁ ক'রে নেটের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে দূরে বেস-লাইনে পড়ে, সেই রকম আর কি। আমরা রয়েছি পাহাড় ঘেঁষে—যেন নেটের গায়ে, শেল যদি পাহাড়ে লেগে ফাটে, ফাটবে ওপারে, নয় পাহাড় টপকে ঐ দূরে গিয়ে ফাটবে—বুঝলে? আমাদের কিচ্ছু ভয় নেই।''

মেজর চাপাগলায় বলল, ''ভয় নেই তো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো না বীরপুরুষ! দুটোতে জুটেছে ভালো।''

সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর জ্যাক আস্তে আস্তে গর্ত থেকে উঁকি মেরে চারদিক সন্তর্পণে দেখে উঠে পড়ল। বু-ও উঠে এল—জীবন্মৃতের মত।

একটু দম নিতে না নিতে দূরে ক্যানেস্তারা পেটানোর মত আওয়াজ হতে লাগল। কে যেন জোর বোমা ফেলছে! মেজর লাফিয়ে একটা টিলার উপর চড়ে পর্যবেক্ষণ করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল তার রানিং কমেণ্টারী,

''৫৮নং পাহাড়—যার নাম 'দাড়িকামানোর বুরুশ'—দেখতে কতকটা ঐরকম কিনা—তার ওপর বোমা পড়ছে। ওটা জাপানীদের দখলে। আমাদেরই একখানা 'হারিকেন' বিমান বোমা ফেলছে—এই পড়ল আরেক পসলা নরম গরম—সাবধানে বন্ধু—ওদিকে একখানা গ্রাম আছে—অযথা তার ওপর বোমা ফেল না। ব্যস্, কাজ খতম—হারিকেনখানা ফিরছে—ওঃ হো—জোর ধোঁয়া উঠছে—গ্রামখানারই

ওপর ফেলল নাকি বোমা—কেলেঙ্কারী—ওরে ও কী! দক্ষিণ দিক থেকে দুখানা জাপানী বিমান আসছে যে—'নেভি জীরো' লড়িয়ে। লক্ষণ তো ভালো নয়, মারবে নাকি?''

এবারে আমরাও দেখতে পেলাম 'হারিকেন' এবং 'নেভি জীরো' দুখানা। জ্যাক বুদ্-কে ফিস ফিস ক'রে বলল, ''একেবারে বে-আইনী, মেজরের অমনি ক'রে টিলার ওপর দাঁড়ানো! ইচ্ছে ক'রে বিপদ ডেকে আনা—শুধু নিজের নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও!'' বুদ্ সাড়া দিল না। মেজর চেঁচিয়ে উঠল,

''অ্যাই রে জোড়া জীরোয় হারিকেনখানাকে তাড়া করেছে যেমন ক'রে কাকেরা চিল তাড়া করে। গর্‌গরাগট্—একদফা গুলি ঝাড়লে—হারিকেনও জবাব দিলে। ফাট্ ফাট্—আমাদের ব্রেনগান মাটি থেকে জাপানীদের জখম করার চেষ্টা করছে—পণ্ডশ্রম—ওরঃ ব্রেনের এক্তিয়ারের ওপরে—এঃ হে। হারিকেনখানা চোট খেয়ে গেল হে—জীরোর সঙ্গে এঁটে উঠবে কী ক'রে বল? জীরো ওড়ে পায়রার রত, এই ওঠে এই পড়ে, এই বোঁ ক'রে এক চক্কর ঘুরে যায়। হারিকেন ওড়ে ঢাউস ঘুড়ির মত, জলদি বাঁকানো চোরানো যায় না। এই পড়ল—প'ড়ে গেল হে হারিকেনখানা—একেবারে নদীর ভেতরে।''

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল রাত্রে। খেয়ে দেয়ে ঘুমোবার উদ্‌যোগ করছি এমন সময় পাহাড়ের উপর জঙ্গলে দুদ্দাড় শব্দ আরম্ভ হ'ল। জ্যাক 'জাপানী আক্রমণ' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলল। অনেকক্ষণ প্রস্তুত থেকে এক গুর্খা শান্ত্রীর কাছ থেকে শুনলাম, জঙ্গলে একটা দুরন্ত বাচ্চা হাতী আছে—সে মাঝে মাঝে প্রাণের আতিশয্যে ছুট মারে এবং সেই শব্দ হেতু এই শব্দ। হাতীর চৌদ্দপুরুষকে গাল দিয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ফ্রণ্ট লাইনে উর্দি পরেই শুতে হয়, তাতে আমাদের কোনো ঘুমের ব্যাঘাত হল না। কিন্তু মেজর রাত্রিবাস পরে শুল। হাই তুলে বলল, ''যদি রাত্রে ধরা পড়ি জাপানীদের দেখিয়ে দেব ভদ্রলোক কী পরে ঘুমোয় এবং যে ভদ্রলোক সে যুদ্ধের উন্মাদনায়ও তার মজ্জাগত ভদ্রতা হারায় না!''

পরদিন বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা এগিয়ে চললাম একে-বারে শত্রুর মুখে।

মেজর বলল, ''ত্রিশূলের মত ফ্রন্টখানা। বাঁয়ের দিকের ফলাটা শেষ হয়েছে ৫৬নং পাহাড়ে—সেখানে আছে রাজপুতানা রাইফ্‌ল্‌জের এক ব্যাটালিয়ন। ডাইনের ফলাটা গিয়ে পড়েছে নদীতে—ওখানকার জিম্মায় ল্যাংকাশীয়ার ফিউজিলীয়ার্স। মাঝ-খানের লিক্‌লিকে তীক্ষ্ম ফলাটা গিয়ে উঠেছে ৫৪নং পাহাড়ে—জাপানীদের একেবারে মুখোমুখি। সেখানে যে ব্যাটালিয়ন তারও সবার আগেভাগে হচ্ছে সর্বজীত সিং কল্‌হার প্ল্যাটুন, জাপানী লাইনের সবচাইতে কাছে। আমরা সেইখানে যাব। কল্‌হার জওয়ানেরা রাইফ্‌ল্‌ তাগ ক'রে বসে আছে, তার পাশে বসবে আমাদের লাউড স্পীকারগুলো।''

বু-র মুখের দিকে চাইলাম। ভাবলেশহীন। বু-র পায়ের দিকে চাইলাম। পা চলছে যন্ত্রচালিতের মত।

মেজর বু-কে আশ্বাস দিয়ে বলল, ''অবশ্য তোমার সেখানে যাবার দরকার নেই। তোমাকে আমরা বসাবো একটা গুহামত জায়গায়। মাইক্রোফোন সেখানেই বসবে, তুমি নিরাপদে তোমার বক্তৃতা দিয়ে যাবে।''

সবগুলো রেস হেরে যাবার পর জুয়াড়ী যদি শোনে সেদিন একটা অতিরিক্ত রেস হবে তাহলে তার মুখে যেমন ক্ষীণ আশার একটুখানি আলো দেখা দেয়, বু-র মুখেও সেইরকম সন্ধ্যারাগ ফুটে উঠল।

আমরা ৫৪নং পাহাড়ে উঠছি। নানাবিধ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেজর বু-র পাশে, তার পিছনে আমি, আর সবার পিছনে জাপানী-ভাষাবিশারদ জ্যাক।

মেজর বলল, ''মৃত্যুভয়ের চেয়ে অনেক বড় ভয় হচ্ছে না-জানার ভয়। স্পেনে যখন ছিলাম, মনে হ'ত যেন প্রত্যেক গাছটির পিছনে

ফ্রাঙ্কোর দু'একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে; প্রত্যেকটি লোকের হাতে উৎকৃষ্ট রাইফ্‌ল্‌ আর তার হাতের টিপ অব্যর্থ। ফরাসী কর্নেল মঁসিয়ে আমার ভয় ভাঙালেন।''

বু-র মুখ থেকে প্রথম কথা বেরোলো, ''কী ক'রে?''

মেজর বললেন, ''মঁসিয়ে শেখালেন ভয় পাবার আগে জানতে হয় ভয় কিসের—শত্রু কোথায় আছে, তার হাতে কী অস্ত্র আর সে অস্ত্রের ক্ষমতা কতদূর। এ জানলেই অহেতুক ভূতের ভয় চলে যায়। তখন যুদ্ধটা হয় মানুষে মানুষে।''

বু জিজ্ঞেস করল, ''কী ক'রে ওসব জানা যায়?''

মেজর বললেন, ''ধরো এই ফ্রণ্টটি—ঐ যে দেখছ দুটো পাহাড়, কাছেরটা নীচু দূরেরটা উঁচু—ওই দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে ছাড়া দিনের বেলায় জাপানীরা কোথাও কাছাকাছি নিরাপদ থাকতে পারে না আমাদের নজর এড়িয়ে। অতএব শত্রু বর্তমানে ওখানে। তাদের কী অস্ত্রশস্ত্র তাও মোটামুটি আমরা জানি। তাই আমি স্পষ্ট জানি আমাদের কোথায় কতক্ষণ থাকা নিরাপদ বা নিরাপদ নয়। সেইটুকু বুঝে চললেই কোনো ভয় নেই। জ্যাক, ঐ ছোট পাহাড়টার নাম কী?''

জ্যাক মুখ লাল ক'রে বলল, ''অমন ক'রে নাম ধ'রে চেঁচাবেন না স্যর, জাপানীরা শুনতে পাবে। আমি সাড়ে তিন বছর জাপানে থেকেছি বহু জাপানী আমায় চেনে। তাদের কেউ কেউ হয়তো ওখানেই আছে।''

মেজর বললেন, ''তাই নাকি? তবে আর আমরা লাউড স্পীকার বয়ে বেড়াচ্ছি কেন? একটু উচ্চৈঃস্বরে জাপানীদের আজকের শেষ সংবাদটা জানিয়ে দাও না—মাত্র আধ মাইল ব্যবধান! অ্যালেকজাণ্ডারও তো খালি গলায়ই গ্রীক অনীকদের সম্বোধন করতেন। জ্যাক, তুমি অত পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? ওল্ড বয়, তুমি আর জ্যাক এগিয়ে যাও। লাউড স্পীকার বসিয়ে সব রেডি কর, আমরা একটু পরে আসছি।''

লাউড স্পীকারগুলো জাপানী অবস্থানের মুখোমুখি বসাতে হ'ল আমাকেই। জ্যাক হঠাৎ আবিষ্কার করল, মাইক্রোফোন আর

ব্যাটারীর তারগুলো বড্ড পাক খেয়ে গেছে—সে নিবিষ্ট মনে বসে বসে সেগুলোর জট ছাড়াতে লাগল। লাউড স্পীকার বসিয়ে আমি একটা "শেয়ালের গর্তে" ব্যাটারীগুলো সাজাচ্ছি এমন সময় বাইরে ফট্ ফট্ ক'রে কতগুলো মর্টার ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার ওপর এক চাঙড় মাটি ধসে পড়ল এবং তার পরেই পড়ি কি মরি ক'রে গর্তে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল জ্যাক।

আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম, "আমার আঙুল গেল—তোমার বুটের নীচে। থেঁৎলে গেল—সরাও পা—বেরোও গর্ত থেকে!"

থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জ্যাক বলল, "গর্ত থেকে বেরোব! শুনছো না মর্টার বৃষ্টি! ওঃ সুইসাইড! সুইসাইড!"

কোনোগতিকে হাত উদ্ধার ক'রে ব্যাণ্ডেজ করলাম। অন্য হাতটা দিয়ে জ্যাককে টেনে বার করতেই লোকটা প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। যাবার সময় বলল, "ওঃ, খুব জোর মনে পড়েছে। আজ ল্যাংকাশীয়ার মেস্‌ে একটা পাঁঠা কাটবে, আমাকে চারটের মধ্যে যেতে বলেছিল। মেজরকে ব'লে দিও আমি যাচ্ছি আমাদের মেসের জন্য মাংস আনতে।"

আমি কাজ শেষ ক'রে মেজরকে সেলুট ঠুকে বললাম, "সব তৈরী স্যর! এবার মাইক্রোফোন বসাতে হবে।" মেজর তখনও বু-কে বোঝাচ্ছিলেন,

"জাপানীরা ফ্রণ্ট লাইনে দিনের বেলায় খামকা নড়াচড়া করে না। হয় ঘাপটি মেরে বসে থাকে, নয় "শেয়ালের গর্তে" ঘুমোয়। মাঝে মাঝে একটু চমকে দেবার জন্য হঠাৎ গুলী-গোলা ছোঁড়ে—তাতে কেউ খুন-জখম হয় না। দেখলে তো সকাল বেলা। তুমি বুক ঠুকে চলো, তোমার কিচ্ছু হবে না, আমি জিম্মেদার।"

আমি বললাম, "ইয়ঙ্গামি নাগা।"

পুতুলনাচের আগে বেদেরা যেমন ক'রে সুতোয় ঝোলা নির্জীব পুতুলগুলোকে টেনে নিয়ে যায়, মনে হ'ল তেমনি ক'রে কেউ বু-র অসাড় দেহটাকে টেনে নিয়ে চলল। ডাইনে বাঁয়ে বসে আছে ছোট ছোট পাহাড়ে কামানের গোলন্দাজ সৈন্য—এক একটি গহ্বরে, তাদের কারো দিকে বু-র খেয়াল নেই, তাদের ঠাট্টা-মস্করাও

তার কানে যাচ্ছে না। পথে একটা জায়তা পড়ল, সেখানে কোনো আবরু নেই, সেখান দিয়ে যাবার সময় সবাই সাবধানে গুঁড়ি মেরে যায়, শুধু বু নিষ্কম্প প্রদীপের শিখার মত সোজা হয়ে চলে গেল। আর একটা জায়গায় পথের একটু নীচে পাহাড়ের ঢালুর উপর ফটাফট গোটা তিন-চার জাপানী মর্টার ফাটল। আমি অভ্যাসমত সটান শুয়ে পড়তে যাচ্ছি, মেজর পিছন থেকে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, "খবর্দ্দার নয়, চলো, এগোও।" বু লক্ষ্যও করল না। তার মুখ দেখে মনে হ'ল সে ত্রিগুণাতীত কোন্ ভূমার রাজ্যে—সেখানে মর্টার কেন ছ'ইঞ্চি হাউইটসার ফাটার শব্দও শোনা যায় না।

হঠাৎ মেজর থেমে বলল, "আরে দেখ, ঠিক যা চেয়েছি তাই। ঐ দেখ।"

সবাই দেখলাম—পাহাড়ের চূড়োয় পরিত্যক্ত একটি প্যাগোডার ধ্বংসাবশেষ। মেজর বলল, "চল, চল, ঐখানে বসবে আমাদের মাইক্রোফোন—ঐ আমাদের বেতার স্টুডিও।"

একজন লেফটেনাণ্ট বাধা দিল। বলল, "স্যর, প্যাগোডার ভিতরটা খুব নিরাপদ, কিন্তু ঢোকার পথটা নয়। আমাদের একজন কর্পোর‍্যালের কাল প্যাগোডা থেকে বেরোবার সময় গুলী লেগেছে।"

মেজর বলল, "দিনে দুপুরে? অসম্ভব!"

"ঠিক সন্ধ্যের মুখে স্যর।"

মেজর বলল, "তাই বলো! জাপানীরা অত বোকা নয় যে, দিনে দুপুরে গুলী ছুঁড়ে দয়া ক'রে আমাদের জানিয়ে দেবে কোথায় তাদের আস্তানা। এখন বেলা তিনটে, এখন আমি যদি প্যাগোডার সামনে দুহাত তুলে নৃত্য করি, তবু আমাকে কোনো জাপানী গুলী করবে না।"

টপ ক'রে লাফিয়ে পাহাড়টার চূড়োয় উঠে মেজর বলল, "এস বু।"

কাল সন্ধ্যেবেলায় যেখানে কর্পোর‍্যালের বুকে গুলী লেগেছিল, বিনা-দ্বিধায় বু সেখানে লাফিয়ে উঠল—সম্মোহিতের মত। তারপর দু'জনে প্যাগোডার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিট দু'-তিন বাদে আমিও মাইক্রোফোন নিয়ে ঢুকলাম।

• মাইক্রোফোন বসল। আমি বু-র কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললাম, "ডাক্তার—হাণ্গি পারারে—প্রাণ খুলে একবার জাপানীদের শুনিয়ে দাও কোরীয়ার বক্তব্য।" মেজর বু-র দিকে চেয়ে নিঃশব্দ মুখভঙ্গী ক'রে বলল—হাণ্গি পারারে।

চোখের পলকে সারা ফ্রণ্ট জাগিয়ে দিয়ে আঠারোটা লাউড স্পীকার গর্জে উঠল,

"নিইহন্নো হেই তাই সান্......"

মেজর কানে কানে বলল, "কী বলছে হে?"

আমি জবাব দিলাম, "নীহন মানে জাপান—বু বলেছে। বোধ হয় জাপানী সৈন্যদের ডেকে ডেকে ও হক কথা শোনাচ্ছে।"

সারা ফ্রণ্ট স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। মর্টার, মেশিনগান, রাইফেল সব চুপ। বু-র মুখ থেকে অনর্গল কথা বেরোতে লাগল. শব্দগুলি সবই অপরিচিত, শুধু মাঝে মাঝে 'স্তালিন গ্রাদ্‌ত' 'ডয়েটস্‌গুনুয়া' প্রভৃতি কথা থেকে আন্দাজ করা গেল রুশ ফ্রণ্টে জার্মানদের নাস্তানাবুদীর উল্লেখ করা হচ্ছে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। বু ব'লেই চলেছে। এবারে আর জার্মানী সম্বন্ধে কিছু নয়। মেজর ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করল. "কী বলছে কিছু আঁচ পাচ্ছ? বার বার 'গুম্‌বাৎসু' 'জাইবাৎসু' বলছে কেন? জ্যাক কোথায়?"

আমি ফিস্ ফিস্ ক'রে বললাম, "জ্যাক মাংসের জোগাড়ে গেছে। 'গুমবাৎসু' মানে যুদ্ধপিপাসু আর 'জাইবাৎসু' মানে অর্থগৃধ্নু—জ্যাক বলেছে। বোধ হয় জাপানীদের বোঝাচ্ছে যে. তাদের যুদ্ধটা কেবল জাপানী সামরিক আর বণিক শ্রেণীর স্বার্থে, জনসাধারণের নয়।"

পনের মিনিট কেটে গেল, বু-র কথার স্রোতে তখনও পূর্ণ জোয়ার। বছরের পর বছর যে-কথা বুকে জমেছে আজ তার তরঙ্গ বাঁধভাঙা নদীর মত ছুটে চলেছে—তাকে 'রোধিবে কে, রোধিবে কে?' সে-কথা তো শুধু বু-র নয়, সে-কথা একটা জাতির, তিন কোটি নিষ্পিষ্ট কোরীয়াবাসীর। বু-র গলা তার বাহনমাত্র।

আমরা প্রাণপণে হাত-মুখ নেড়ে, চোখ টিপে, কাগজে লিখে

৬

বুকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ব্যাটারীর তেজ ফুরিয়ে যাবে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, জাপানীরা গুলী করবে, অন্ধকারের সুযোগে তারা প্যাগোডায় চড়াও হয়ে বুকে জ্যান্তে ধরে নিয়ে যাবে, নখে ছুঁচ ঢুকিয়ে পেটের গুপ্তকথা বার ক'রে নেবে—কিছুতেই কিছু হ'ল না। বু অবিশ্রান্ত ব'লে চলল, "নিহঙ্গ. .জাইবাৎসু...গুমবাৎসু..."

বরাট বললে, "ওটা সুকার্ণ, সোয়েকার্নো নয়।"

দেশ-বিদেশের খবর আমাদের আপিসে এক পালিতই রাখে। আমরা খবরের কাগজে পড়ি খেলার খবর, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানির খবর, উড়ো উদ্ভট খবর। শুধু পালিতই মাঝে মাঝে আমাদের পড়ে শোনায় আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা।

এ-দফায় সে শোনাচ্ছিল প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোর দ্বিতীয় সংসারের আনুপূর্বিক বিবরণ। তারি মধ্যিখানে আমাদের নতুন ইশু ক্লার্ক বরাট ব'লে বসল, "সোয়েকার্নো নয়, সুকার্ণ।"

রসভংগ হওয়ায় চটে উঠে পালিত বললে "নয় মানে! পষ্ট লেখা রয়েছে এস্ ও ঈ, তবু বলব 'সু'?"

বরাট বললে, "কেন, এস্ এইচ ও ঈ তো "শু" !

পালিত বললে, "ওটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম।"

বরাট বললে, "ইংরিজী ভাষায় তাই বটে, কিন্তু ওলন্দাজ ভাষায় ওইটেই নিয়ম। ইন্দোনেশীয়া সাড়ে তিনশো বছর ওলন্দাজদের দখলে ছিল, তাই সেখানে বানান করা হ'ত ওলন্দাজ নিয়মে যেমন আমাদের দেশে লাতিন হরফে বানান হয় ইংরিজী নিয়মে।"

আপিসশুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে বরাটের দিকে চেয়ে রইল। কোন্ ভাষায় বানানের কী নিয়ম তা জানবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের কখনো হয়নি, হবেও না। কিন্তু দুদিনের শিশু ইশুক্লার্ক বরাট, যার বাঁধা কাজ হ'ল আপিসের এক কোণায় বসে রিসীট রেজিস্টারের ওপর মাথা রেখে ঘুমোনো, সে হঠাৎ ওলন্দাজ বানান নিয়ে পালিত-হেন বুজরুক ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল কেন, তা আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারলাম না।

নারাণদা আমাদের আপিসের সমস্ত বিবাদের প্রাড্‌বিবাক। তিনি দুজনের মাঝে পড়ে বরাটকে জিজ্ঞেস করলেন,

"কী ক'রে তুমি জানলে?"

পালিত হাত-মুখ নেড়ে বললে, "তা জানেন না বুঝি? প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো—থুড়ি, সুকার্ণ—যে বরাটের নেহাৎ আলাপী লোক। ঘন ঘন ও'দের যাওয়া-আসা চলে, খানাপিনাও দুজনের একসঙ্গেই হয়। বরাট না গেলে প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদে কোনো মাইফেলই জমে না—শোনেননি সে কথা?"

হো হো ক'রে আমরা হেসে উঠলাম।

বরাটের সে হাসিতে যোগ দেবার কথা নয়, তবু সেও হাসল। সে হাসি মজার নয়, ঠাট্টারও নয়—মনের আধখানা অতীতে তলিয়ে গেলে মানুষ যেমন না জেনে হাসে সেইরকম হাসি বরাটের মুখে ফুটে উঠল।

আমাদের অট্টহাস থামবার পর বরাট বললে, আস্তে আস্তে,

"পালিত মিথ্যে বলেনি। প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণর সঙ্গে বাস্তবিকই আমার পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে বসে খাওয়ার সৌভাগ্যও আমার দুচারবার হয়েছিল।"

বরাটের কথা শুনে আমরা দস্তুরমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। দাবার আড্ডায় অব্যর্থ মাতের মুখে অভাবনীয় একটা বড়ে ঠেলে দিয়ে খেলার রোখটা যদি কেউ হঠাৎ একেবারে পাল্টে দেয়, তাহলে যেমন দর্শকেরা বিভ্রান্ত হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইতে থাকে, আমরাও বরাটের কথা শুনে তাই করতে লাগলাম।

কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরোলো না। পালিতও কেমন হকচকিয়ে গেল। সবাই আমরা বুঝলাম একটা কিছু বলা আবশ্যক, কিন্তু সেটা কী আমরা কেউই ঠাউরে উঠতে পারলাম না। টাইপিস্ট নিবারণ, যে কথায় কথায় সবাইকে বলে, "বাবা, শুল্ দিচ্চ!" সেও নীরব। কনিষ্ঠ রসময়, কেরানী, বারবার নারাণদার দিকে চোখ টিপে ইঙ্গিত ক'রে কোনো সাড়া না পেয়ে ব'লে ফেলল।

"আমরা কি দাঁতে কাঠি দিয়ে চুক্করে বসে থেকে টিফিনটা কাটাবো? বলুন না কিছু একটা!"

নারাণদা শুধু বললেন, "অ্যাঁ?"

বরাট বললে, "কথাটা আশ্চর্য শোনাচ্ছে? তা শোনাবে বই

কি—অন্তত আজ। তবে ন’ বছর আগে ইন্দোনেশীয়ায় একথা শুনলে কেউ অতটা অবাক হ’ত না। কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতো তখন —সেসব আজ শুনলে মনে হবে আজগুবী গল্প।’’

নারাণদা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন,

‘‘তাইতো, তোমার সার্ভিস-বুকে লেখা ছিল বটে তুমি লড়ায়ে গিয়েছিলে। ভুলেই গিয়েছিলাম সেকথা।’’

নিবারণ বললে, ‘‘আর আপনি সে খবর বিলকুল চেপে দিয়ে যক্ষের মত বসেছিলেন? খুব লোক যা হোক। বাবা বরাট, এসো তো তোমার কোণটি ছেড়ে ঘরের মধ্যিখানে। ইঁটে বোসো বাপ এবং কিছু ছাড়ো।’’

হিড় হিড় ক’রে নিবারণ বরাটের হাত ধ’রে টেনে এনে তাকে বসাল নারাণদার পাশের চেয়ারে।

চাপরাসীর উপর হুকুম হ’ল এক প্রস্ত চায়ের। চর গেল দোতলায় সায়েবদের চলাফেরার সংবাদ নিতে। জানা গেল বড়সায়েব ম্যাকনীল ব্যারি কোম্পানীর এক স্কচ সায়েবের সংগে লাঞ্চ খেতে গেছেন, ছোটসায়েব দরজা ভেজিয়ে চাপরাসী পাহারা রেখে আরাম-কেদারায় ঘুমোচ্ছেন। কোথাও কোন বিপদের আশংকা নেই, তবু রীসেপ্‌শ্যানিস্টকে টিপে দেওয়া হ’ল, হঠাৎ কিছু ঘটে গেলে তড়িঘড়ি টেলিফোনে সংবাদ পাঠাতে। চারদিক গুছিয়ে নিবারণ হুকুম দিলে,—

‘‘নাও বাবা বরাট, অল্প সময় হাতে, নাতিদীর্ঘ একখানা ফরমাও। লড়াই-ফড়াইয়ের গল্প ফেঁদো না, আমরা ছাঁ-পোষা লোক. ওতে রস পাবো না। আপামরসাধারণ সুখ পায়, এমন একখানা কিছু ঝাড়ো।’’

আমরা সবাই একবাক্যে বললাম, ‘‘হ্যাঁ।’’

বরাট বললে, ‘‘তা হলে বান্‌দুংএর গল্পটাই বলি। ঘটনাটা একেবারে লড়াইবর্জিত নয়—কী ক’রে হবে? সেপাই-এর গল্পে লড়াই-এর গন্ধ একটু থাকবেই। তবে সে অতি সামান্য—সেটুকু ত্রুটি আপনারা নিজগুণে মাপ ক’রে নেবেন।

বান্‌দুং যবদ্বীপে।

ইন্দোনেশীয়ায় এক হাজারের ওপর দ্বীপ। কোনোটা মস্ত, কোনোটা ছোট্ট। বিরাট দ্বীপ সুমাত্রা—তার একমাথা গেছে দক্ষিণে বিষুবরেখা পেরিয়ে যবদ্বীপের কাছাকাছি, আর অন্য মাথা ঠেকেছে উত্তরে নিকোবরের সন্নিকটে। আবার ছোট্ট দ্বীপ বান্দা—হাঁটাপথে তার এক মুড়ো থেকে আরেক মুড়োয় যেতে আধ ঘণ্টাও লাগে না। এই দ্বীপে ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশীয়ার প্রথম প্রধান-মন্ত্রী শাহ্‌রিয়ারকে আটক ক'রে রেখেছিল।

কিন্তু ইন্দোনেশীয়ার আদত দ্বীপ হ'ল যবদ্বীপ—সাত কোটি ইন্দোনেশীয়ের সাড়ে চার কোটির বাস ঐখানে।

কত রকমের লোক ইন্দোনেশীয়ায়। সেলীবীজ দ্বীপ—যাকে ত্রিশূলের মত দেখতে ব'লে ইন্দোনেশীয়েরা বলে 'সুলবসী' —তার এক প্রান্তে মিনাহাসা—সেখানকার লোকেদের জাপানীদের মত দুধে-আলতার রঙ। আম্বন দ্বীপ, তার অধিবাসীদের রঙ কাফ্রীদের মত কালো, মাথার চুলও তাদেরই মত কোঁকড়া—এই সেদিন সেখানে লড়াই হয়ে গেল। আম্বনীরা বড় একরোখা একগুঁয়ে। বোর্নিও—ইন্দোনেশীয়েরা বলে কালিমান্‌তেন, সেখানে বন্য ডায়াকদের বাস, তাদের ভাঁড়ারে মানুষের মাথার খুলি পাওয়া যায়। সুমাত্রার দক্ষিণ অঞ্চলে মিনাংকাবাউ, সেখানকার অতি-সভ্য লোকের সঙ্গে দুনিয়ার লোক ব্যবসা করে—সসম্ভ্রমে। তাদের কূটবুদ্ধির কাছে অতিধূর্ত ইংরেজও হার মেনে যায়। আর বলিদ্বীপ—ইন্দোনেশীয় উচ্চারণে 'বালি,' তার কথা আর কী বলব, আপনারা তো জানেনই। সেও ইন্দোনেশীয়ায়।

এক যবদ্বীপেই তিন-চার জাতের লোক বাস করে। পূর্বে বলিদ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চলটায় থাকে মাদুরা জাতি—বাহাদুর লড়িয়ে জাত। মধ্যিখানে থাকে 'অরাং যব,' অর্থাৎ খাস যবজাতি, যাদের নামে দ্বীপের নাম যবদ্বীপ। যবেরা গ্রামভারী সনাতনী জাত, ওজন ক'রে হাসে গায় কথা কয়। তাদের ভাষায় বাণী অকারান্ত। কলিঙ্গের শৈলেন্দ্র রাজবংশ যবদ্বীপে রাজত্ব করেছিল, তারাই হয়ত 'অ'দের ছেড়ে গেছে।

পশ্চিম প্রান্তে থাকে বান্তামী লোক—অতিশয় গোঁড়া, রসকষ-

হীন। ইন্দোনেশীয়ার রাজধানী জাকার্তা এই বান্তামেরই একটেরে। তবে জাকার্তা একে রাজধানী তায় বন্দর। নানান্ দেশের নানা জাতি এখানে আড্ডা গেড়েছে, তাদের সবার সঙ্গে রগড়ারগড়ির ফলে জাকার্তাবাসী আকারে বান্তামী হলেও প্রকারে নয়। জাকার্তা-বাসীর রস আছে, যদিচ সে রসে শ্লেষের ভাগটাই বেশী। সেরা রসিক হ'ল জাকার্তার সাইক্‌ল-রিক্‌শাওয়ালারা। ঢাকার গাড়োয়ানদেরই মত তারা চটপট পাল্টা জবাবে দড়, আর তাদেরই মত মর্মভেদী তাদের কথার খোঁচা।

একদিকে জাকার্তা, আর অন্যদিকে যবজাতির দেশ মধ্য-জাভা, এ দুয়ের মাঝখানে আরও এক জাতির বাস, তাদের নাম 'অরাং সুন্দা' অর্থাৎ সুন্দ জাতি। দিল্‌খোলা আকারান্তা ভাষা, নিত্যি-নতুন রঙ্গ আর কথায় কথায় হাসি—এই নিয়ে যবদ্বীপের সুন্দ প্রদেশের সুন্দ জাতি।''

নিবারণ জিজ্ঞেস করলে, ''দেখ্‌তে কেমন?''

বরাট বললে, ''সুন্দর। যবজাতির মধ্যেও সুন্দরী আছে, কিন্তু সে সব রাজারাজড়ার ঘরে। পথে, পাহাড়ে, ধানের ক্ষেতে সুন্দরী মেলে এক যবদ্বীপের সুন্দ প্রদেশেই। কতকাল কেটে গেছে, কিন্তু এখনো প্রাণখোলা হাসি শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুন্দ মেয়ের মুখ, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে বান্দুঙের কথা—সুন্দ প্রদেশের সেরা শহর বান্‌দুং।

''বান্‌দুং আমার হয়ত কখনো দেখা হ'ত না, কারণ আমাদের ইউনিটের ঘাঁটি ছিল জাকার্তায়। ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল।

গোস্তাকী মাফ হয় নিবারণ, এখানে একটু গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদতে হবে, নচেৎ বিষয়টা পরিষ্কার হবে না, আর গল্পও বড্ড শীগ্‌গির শেষ হয়ে যাবে। জিনিসটায় একটু সামরিক ময়ান থাকবে, অতএব আপনাদের যাঁদের ঘুমের দরকার তাঁরা এই ফাঁকে কাজ সেরে নিন।''

টেবিলের উপর পা তুলে দিতে দিতে নারাণদা বললেন, "তথাস্তু। সময়ে তুলে দিও।"

বরাট বলতে লাগল, "জাপান রণে ভঙ্গ দিল ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। এর ঠিক দুদিন বাদেই সুকার্ণ ইন্দোনেশীয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।"

ওলন্দাজদের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল।

ইউরোপে লড়াই খতম হওয়ার পর জার্মানির পত্‌সদাম শহরে ব'সে চার্চিল আদি নেতৃবৃন্দ যুক্তি করেছিলেন, জাপান হেরে যাওয়ার পর জাপানের দখলে দেশগুলো যার যার তার তার কাছে ফিরে যাবে। ইন্দোনেশীয়া আগে ছিল ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, ভূগোলে তার নাম ছিল 'ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ'। অতএব পত্‌সদামের রফা অনুসারে ইন্দোনেশীয়া আবার ওলন্দাজ তাঁবেয় চলে আসবে—এইটেই ছিল ওলন্দাজ সরকারের মত। লগ্ন এল. জাপান আত্মসমর্পণ করল, কিন্তু বাড়াভাতে ছাই দিল সুকার্ণের স্বাধীনতা ঘোষণা!

ব্রিটিশ কর্তারাও ফাঁপরে পড়লেন। তাঁদেরও হিসেবে ইন্দোনেশীয়া ওলন্দাজদের—কিন্তু সেকথা তখন বিনাযুদ্ধে প্রমাণ করা অসম্ভব। যদি দেশটা তখনও জাপানীদের দখলে থাকত, যুদ্ধ ক'রে তাদের দখল ঘুচিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু সুকার্ণের স্বাধীনতা ঘোষণার পর দ্বীপগুলোর হেফাজতি হাতে নিলে ইন্দোনেশীয় সৈন্যেরা। তখন জোর ক'রে ইন্দোনেশীয়া দখল করতে গেলে লড়তে হয় জাপানীদের সঙ্গে নয়, সাত কোটি স্বাধীন ইন্দোনেশীয়দের সঙ্গে।

শক্ত কাজ।

আর সে কাজ করবে কে? মিত্রশক্তির সৈন্যেরা ক্লান্ত। যতদিন যুদ্ধ চলছিল, একরকম চলছিল, জাপানের আত্মসমর্পণে সে যুদ্ধের অবসান হয়েছে। আবার একটা নতুন লড়াই বাধাতে হলে নতুন লোক আমদানী করো—পুরোনো পাপীদের বিদেয় করো, ঘরে পাঠাও—এই ছিল মিত্র-সৈন্যদের মনোভাব। তাছাড়া, মিত্র-সৈন্যদলের সেনানীরা ব্রিটিশ হলেও সৈন্যদলের বেশীরভাগই ভারতীয়,

অফিসারদের মধ্যেও ভারতীয় বহু। তারা মনে-প্রাণে স্বাধীন ইন্দোনেশীয়ার বিরুদ্ধে লড়বে কি?

ওলন্দাজ সৈন্য?

ওলন্দাজ সৈন্য তখনও গোকুলে বাড়ছে। তাদের কিছু ব্রিটেনে, কিছু আমেরিকায় যুদ্ধবিদ্যার তালিম নিচ্ছে, লড়াইয়ের যুগ্যি তারা হয়নি। ওলন্দাজ জাহাজ খানকয়েক হাতে আছে, কিন্তু সৈন্যবল তাদের শূন্য।

এইসব নানা কথা চিন্তা ক'রে মিত্রপক্ষের কর্তারা দূর থেকে আকাশবাণী করলেন—ইন্দোনেশীয়ার রাজনীতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা তাঁদের ইচ্ছা নয়, তবে তাঁদের সেখানে একটু যাওয়া প্রয়োজন। পত্‌সদাম চুক্তি তাঁদের স্কন্ধে দুটি গুরুভার অর্পণ করেছে, সে দুটি পালন করবার জন্য কিছু সৈন্য তাঁদের ইন্দোনেশীয়ায় মোতায়েন করা দরকার।

কর্তব্য দুটি কী?

দূত গিয়ে স্বাধীন ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্টকে জানালে, কর্তব্য দুটি হচ্ছে (১) ইন্দোনেশীয়া থেকে জাপানী সৈন্যদের সরিয়ে তাদের দেশে পাঠানো এবং (২) জাপানীরা যুদ্ধের সময় যাদের বন্দী করেছিল, তাদের মুক্ত করা। প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণ সর্বাধিনায়ক মাউণ্টব্যাটেনকে জানালেন যে, এইটুকুই যদি তাঁর সৈন্যদের কর্তব্য হয়, তবে ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট তাদের বাধা তো দেবেই না, বরং সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

সুকার্ণর অনুমতি পাওয়ামাত্র আমাদের সিঙ্গাপুর থেকে ইন্দোনেশীয়ায় রপ্তানি করা হ'ল। প্রথমে এলাম আমরা জাকার্তায়। তারপর ক্রমে ক্রমে যখন মেলাই সেপাই সেখানে এসে জড়ো হ'ল, তখন তাদের দল ভেঙে এক ভাগ রাখা হ'ল পুবে, 'সুরভয়' অর্থাৎ সুরাবায়া বন্দরে, আর একভাগ রাখা হ'ল সেমারাং বন্দরে, যেখান থেকে বিদেশী জন বোরোবুদুর-প্রাম্বানান দেখতে যায়।

বোরোবুদুর-প্রাম্বানানের অপূর্ব পাথর খোদাইয়ের কাজ দেখবার সৌভাগ্য অবশ্য আমাদের সৈন্যদের কখনো হয়নি। সেমারাংএ যারা থাক্‌ত, তাদের চরে খেতে হ'ত সেমারাং বন্দর, আর

তার আশপাশের সূচ্যগ্রপ্রমাণ জমিতে। উত্তরে সমুদ্র, আর দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে কাঁটাতারের বেড়া—এই চৌহদ্দী ডিঙোলেই সদরে তলব হ'ত। কখনও কখনও ইন্দোনেশীয় প্রহরীদের হাতেও নাকাল হ'তে হ'ত।

জাকার্তায় আমরা বোরোবুদুরের ছবি দেখতে পেতাম—জাদুঘরে। এখানেও শহর ছেড়ে বেরোবার জো ছিল না। অন্তরে অন্তরে আমরা ভারতীয়েরা ছিলাম ইন্দোনেশীয়দের দিকে, চাইতামও তাদের সঙ্গে মিশতে, তাদের দেশ দেখতে। কিন্তু সেকথা মুখে বললে ইন্দোনেশীয় পাহারাওয়ালা মান্‌বে কেন? তারা জানে আমরা তাদের দেশে এসেছি দুটি নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য। সে কর্তব্য করবার যথাযথ স্থান সমুদ্রোপকূলের তিনটি বন্দরে—জাকার্তা, সুরাবায়া, সেমারাং। দেশের অভ্যন্তরে আমাদের কী কাজ? স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশীয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কি?

''অভ্যন্তরে একটা ঘাঁটি আমাদের দেওয়া হয়েছিল—বান্‌দুংএ। এ অঞ্চলে দু'দল বন্দীরই বিরাট একটা আড্ডা ছিল। ওলন্দাজ, আধা-ওলন্দাজ এবং নানা জাতের পাঁচমিশেলী—যাদের জাপানীরা বন্দী করেছিল, তাদের একটা ক্যাম্পে জমা করা হয়েছিল—মাথা গুনতির জন্যে। এসব বন্দীদের পুরো একখানা ফিরিস্তি আমাদের হাতে ছিল; আমাদের কাজ ছিল সেই ফিরিস্তির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দফায় দফায় তাদের ক্যাম্প থেকে সরানো। হুট ক'রে সবাইকে ছেড়ে দিলে কে কোথায় গেল তার পাত্তা পাওয়া যাবে না ব'লে ভূতপূর্ব বন্দীদের ক্যাম্পেই রাখা হয়েছিল, ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তা' ছাড়া ফিরিস্তিতে নাম আছে, অথচ ক্যাম্পে নেই এমনটা দেখা গেলে জাপানীদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে লোক কোথায় গেল।

ইন্দোনেশীয়া যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করল, তখন কোনো কোনো অঞ্চলে জাপানীরা বাধা দিয়েছিল। তার ফলে কিছু জাপানী ইন্দোনেশীয়ার হাতে বন্দী হ'ল। যেখানে কোনো হাঙ্গামা হয়নি, সেখানেও জাপানীরা নিজেরাই নিজেদের বন্দী ক'রে কাঁটা-তারের বেড়া-ঘেরা ক্যাম্পে জমায়েত হ'ল, বা-কায়দা মিত্রসৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য। অদ্ভুত জাত, হুকুম হ'ল 'লড়ো', বাঘের মত জান কবুল ক'রে লড়ে গেল, হুকুম হ'ল 'আত্মসমর্পণ কর', হয়ে গেল কুসুমাদপি মৃদু।

বান্দুং থেকে বন্দী সরিয়ে এনে তাদের জমা করা হ'ত জাকার্তায়। প্রথম প্রথম কাজটা বেশ এগিয়েছিল। দলে দলে কাউকে রেলে, কাউকে লরীতে, কাউকে উড়োজাহাজে আনা হচ্ছিল। কিন্তু পর পর কতকগুলো হাঙ্গামা হয়ে সে পথে কাঁটা পড়ল।

ইন্দোনেশীয়েরা দেখল, ব্রিটিশ সৈন্যদল যেখানেই ঘাঁটি গাড়ছে, সেখানেই ওলন্দাজ কর্তা-ব্যক্তিদের আনাগোনা হচ্ছে—যাদের মতে ইন্দোনেশীয়া ওলন্দাজদের ভূসম্পত্তি। আমদানী ওলন্দাজদের সঙ্গে ইন্দোনেশীয়দের খিটিমিটি লেগে যাচ্ছে, আর সেই সূত্রে ব্রিটিশদের সঙ্গে ইন্দোনেশীয়দের ফাটাফাটি হচ্ছে। অতএব কাল-ক্রমে বান্দুং জাকার্তার মধ্যে রেল-চলাচল বন্ধ হ'ল। লরী চলা-চলের পথেও ঘন ঘন কাঁটাতারের বেড়া পড়তে লাগল। ইন্দোনেশীয় যুব-সঙ্ঘগুলোর প্রচারের সুর ক্রমেই মারমুখো হতে লাগল। এক-দিকে ওলন্দাজ উস্কানি, অন্যদিকে গরম-রক্ত যুব-সঙ্ঘদের পাল্টা জবাব—এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে নরম দলের ইন্দোনেশীয়দের কাল-ঘাম ছুটতে লাগল।

স্থলপথে চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। বন্দী সরানোর কাজ চলতে লাগল উড়োজাহাজে। তাতেও হাঙ্গামা একেবারে বন্ধ হ'ল না। ওলন্দাজ ক্যাম্প থেকে বান্দুং বিমানঘাঁটি প্রায় সাত মাইলের পথ। সারা পথটা কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা, তাতে ঘন ঘন ব্রিটিশ-গুর্খা-ভারতীয় সৈন্যের টহল, কিন্তু বেড়ার বাইরেই খোলা জমি, তাতে ইন্দোনেশীয়ার দখল। লরীর সারি চলাফেরা করার সময় কখনো এ তরফ, কখনো ও তরফ থেকে গোলাগুলী ছোঁড়াছুঁড়ি হয়।

হাতে বন্দুক আর মনে সন্দ থাকলে গুলী প্রায় আপ্সেই বেরিয়ে যায়। আর যেমনি এক গুলী ছোটে, তার জবাবে ছোটে দশ গুলী— এমনি ক'রে মিলিটারী ঝন্ঝাট পাকিয়ে ওঠে।

কিন্তু শ্রাদ্ধ বেশীদূর গড়াতে দেবার ইচ্ছে কোনো পক্ষেরই ছিল না। সুতরাং দু'দলের শান্তি-বৈঠক বস্‌ল—বান্দুংএ নয়, জাকার্তায়। বান্দুং অঞ্চলের গভর্ণর দাত' জামিন, বান্দুং শহরের মেয়র সামসুদ্দীন জাকার্তায় এলেন, আলাপ-আলোচনা শুরু হ'ল। প্রথমে খানিকটা বচসা হ'ল, তারপর কতকগুলো শর্তে একটা রফা হ'ল।

ইন্দোনেশীয় দল বললেন, জাকার্তায় দু'দলে মোটামুটি এক-রকম বনিবনা আছে, কিন্তু বান্দুংএর ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদের হালচাল বড় রুক্ষ। জাকার্তায় যে রফা হয়, বান্দুংএর ব্রিগেড সেগুলো মেনে চলে না। ইন্দোনেশীয়দের অনুরোধ, ব্রিটিশ দল যেন জাকার্তা থেকে দু-চারজন মিলিটারী অফিসর কিছুদিনের জন্য বান্দুংএ মোতায়েন রাখেন, রফার শর্তগুলো ঠিক ঠিক মানা হচ্ছে কিনা দেখ্‌তে।

জাকার্তার ব্রিটিশ কর্তারা বল্‌লেন, বেশ।

সেই সূত্রে আমার বান্দুং যাওয়া। উড়োজাহাজে।

এর আগে যেসব উড়োজাহাজে চলাফেরা করেছি সেগুলোকে বলা যেতে পারে 'উড়ন্ত পিঞ্জর'। তাতে আসবাবের মধ্যে থাকে একজোড়া টানা বেঞ্চি, লম্বালম্বি ফেলা। সে বেঞ্চিতে বসে মালুমই হয় না উড়োজাহাজে চড়েছি। মনে হয় মফঃস্বলে থার্ড ক্লাস ছ্যাকড়া গাড়ীতে চেপে ঝড়ঝড়ে রাস্তা দিয়ে ট্রেন ধরতে চলেছি। দুটি বেঞ্চির একখানি এ-দেওয়ালে একখানি ও-দেয়ালে আঁটা, তারি ওপর বসে থাকে মুখোমুখি—ক্লান্ত, বিরক্ত, দুসারি সেপাই। সারাপথ ওপাশের জুড়ী সেপাইটির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে এমন হয় যে চোখ বুজলেও সে-মুখের প্রত্যেকটি আঁচিল দেখতে পাওয়া যায়। যদি কখনও বাইরেটা দেখবার বাসনা হয় তবে ধনুষ্টঙ্কার রুগীর মত ঘাড়-পিঠ দুমড়ে পিছনে বিঘৎ প্রমাণ জান্‌লার ফোকর মারফৎ দেখতে হয়। জানলার কাঁচটি থাকে অত্যন্ত ময়লা, এবং

তার ভিতর দিয়ে প্রায়শঃ দেখা যায় শুধু একখানা ম্যাড়মেড়ে রঙের উড়োজাহাজের ডানা।

বান্দুংএ উড়ে গেলাম তোফা একখানি বাহনে, যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'উড়ন্ত ট্যাক্সি'। এ জাহাজে যাত্রীর মুখ থাকে সুমুখের দিকে। জানলা পাশেই, তার কাঁচ সরানো যায়—দোতলা বাসের মতো, আর বাইরেটা অবাধে দেখা যায়।

এই জাহাজেই আমার প্রথম যবদ্বীপ দর্শন হ'ল, এর আগে যা দেখেছিলাম সেটা জাকার্তা, যবদ্বীপ নয়।"

নারাণদা এক চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "চোখ খুলব?"

বরাট বললে, "না না, বুঁজে থাকুন চোখ। চোখ খুললে দেখবেন এই অফিসের ছাত আর কতকগুলো অর্থহীন কড়ি-বরগার জালি। চোখ বুঁজে আমার ঘুমপাড়ানি গল্প শুনুন, দেখবেন আমি পাখী হয়ে যা দেখেছিলাম—বান্দুংএর পথে।

দেখেছিলাম একখানা পাতা গালিচা, তাতে সারি সারি নানা রঙের বিচিত্র নক্‌শা। চিরবসন্তের দেশ যবদ্বীপ, ফুল-ফল ফলে সারা বছরই। পাশাপাশি মাঠে চাষীরা ফসল কাটে, চারা বোনে। কোথাও জল ধ'রে পুকুর ক'রে রাখা হয়, আকাশ থেকে দেখায় ঝক-ঝকে রুপোর আর্শির মত; কোথাও তাতে পড়ে এক-দুখানি বীজ-ধানের সবুজ আভা। কোথাও ক্ষেতে সবুজ ধানের পাশেই পাকা ধান—পান্নার পাশে সোনা, আবার তারই পাশে সদ্যচষা মাটির গেরুয়া—বিলাসে সন্ন্যাসে মাখামাখি। কোথাও জমি সমান, তাতে দাবার ছকের মত চৌকো ক'রে কাটা ক্ষেতের সারি, আড়াআড়ি, লম্বালম্বি। কোথাও টিলার জমি, তার উপর সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে কাটা ক্ষেতের সাতনরী দশনরী হার।

তারপর এল পাহাড়।

জমি থেকে পাহাড় যেমন ঢেউ খেলানো দেখায়, উড়োজাহাজ থেকে তেমন দেখায় না। অল্প উঁচু পাহাড়গুলোকে উড়োজাহাজ থেকে দেখায় পিঁপড়ের ঢিবির মত, আর বড় পাহাড়ের চূড়োগুলোকে দেখায় অভ্রভেদী উঁচু। বানদুংএর পথে পড়ে এমনি এক জোড়া উঁচু চূড়ো—দেখে মনে হয় যেন সঙ্গীনধারী বন্দুক কাঁধে সটান সোজা দুটি সান্ত্রী, পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে।

দুই দিকে দুই দ্বারপাল, মধ্যিখানে হাট ক'রে খোলা সিংহ-দ্বার। তারই মধ্যে দিয়ে মাথা নুয়ে আমাদের উড়োজাহাজ ঢুকলো বান্‌দুংএর আঙিনায়।

ভুলে গেলাম চেয়ে আছি মাটির দিকে। মনে হ'লো চোখের সামনে এক আলো-ঝলমল্‌ নাচের আসর। নটী বান্‌দুং, ঘূর্ণি নেচে কুর্নিশ ক'রে দর্শকের বাহবা নিচ্ছে। ঝকমকে বাড়িগুলো তার হীরে জহরত, আর নানারঙের ক্ষেত আর সবুজ মাঠের ঘেরটা তার ডোরা ডোরা কাটা ঘাগরা। চারদিকে ছড়ানো ফিকে নীল, গাঢ় নীল পাহাড় যেন তার মালা ছেঁড়া টুকরো টুকরো মণিমুক্তো আর ঝরণা ঝোরা পাহাড়ে নদীর ঝিকিমিকি যেন সল্‌মা চুম্‌কির।

দিবাস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে দিয়ে উড়োজাহাজ ঠেকল শক্ত মাটিতে। ফুরোলো আধঘণ্টার ছুটি, আবার সৈনিক জীবনের সেলাম ঠোকার পালা এল। উড়োজাহাজে সহযাত্রী ছিলেন গণ্যমান্য দুজন ইন্দোনেশীয়—তাঁদের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল, আমাদের রক্ষীরাই তাঁদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে নির্বিঘ্নে মিত্রশক্তির এলাকা পার ক'রে দিয়ে ইন্দোনেশীয় সীমান্তে পেঁৗছে দেবে। আমি চেয়ে চিন্তে একটি ১৫-হন্দর ট্রাকে জায়গা জোগাড় ক'রে হেড্‌কোয়ার্টারের দিকে এগোলাম।

বড়কর্তা ব্রিগেডীয়ারের সঙ্গে দেখা হ'ল না। মেজকর্তা ব্রিগেড মেজর, বিশদভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বললাম বান্‌দুংএ আমার আসার হেতু। বললাম ইন্দোনেশীয়দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর কাজে যদি আমার দ্বারা কোনো সাহায্য হয় তবে বান্দা প্রস্তুত—

মেজকর্তা বললেন, 'হ্বঁ। তা বেশ, তুমি দ্ব'দিন থাকো, ওলন্দাজদের ক্যাম্পট্যাম্প ঘ্বরে দেখ। সময়ে দেখা যাবে কন্দ্বর কী করা যায়।''

একদিনেই হাঁপিয়ে উঠলাম। কেন ব্বঝিয়ে বলছি।

শহরের মাঝ বরাবর রেল লাইন। তার উত্তরে কাঁটাতারের বেড়া, ওলন্দাজ ক্যাম্প আর ব্রিটিশ সৈন্য শিবির; দক্ষিণে ঢালা জমি, নীল পাহাড় আর ইন্দোনেশীয় বসতি। এদিক ওদিকের মধ্যে যাওয়া-আসা বন্ধ, দ্ব পিঠে হাতিয়ারবন্দ্ পাহারা। ঠিক যেন লেক-পল্লী আর বজবজ লাইনের ওপিঠ, দ্বয়ের মাধ্যখানে দ্বর্ভেদ্য দেওয়াল।

আবহাওয়া অতি বিষাক্ত। বিরাট একটা রেফিউজী ক্যাম্পের মত ওলন্দাজ আধা-ওলন্দাজদের ক্যাম্প; নিরানন্দ অবসন্ন মান্বষের বিশৃঙ্খল জমায়েত—ভাঙা দালানের ছড়ানো ইঁটের মত। ক্যাম্পে হাসে শ্বধ্ব এক ছেলের পাল, তাও ব্বড়োদের তাড়া খেয়ে থেমে যায়। ব্বড়োদের গজর গজর চলে অবিশ্রান্ত—

''হ্বঃ, আমাদের উদ্ধার কত্তে এসেছেন কত্তারা। যারা 'বন্দী'—জাপানীরা—তারা দিব্বি গাড়ী চড়ে ঘ্বরে বেড়াচ্ছে, আর আমরা 'স্বাধীন', য্বদ্ধ জিতে মিত্রশক্তিরা আমাদের 'ম্বক্তি' দিয়েছেন, আমরা এখনো আছি জাপানী আমলের বন্দী শিবিরে—সেই তেরপলের ছাতওলা কাঠের তক্তার ঘরে বাস, পরনে সেই ছেঁড়া কাপড়, বরাদ্দ পিণ্ডি সেই একম্বঠো ভাত। হ্বঃ, 'ম্বক্তি'! যতসব—''

দ্বরন্ত ছেলেগ্বলো তেরপলের বেড়া ফাঁক ক'রে দেখে কাঁটা বেড়ার ওপারে দ্বরের নীল্ল পাহাড়।

অফিসারেরা বলে ঐ নীল পাহাড়ে ল্বকিয়ে থাকে ''পম্বডা''রা। মাঝে মাঝে গ্বলী ছোঁড়ে নিঃসহায় শিবিরবাসীদের উপর। কখনও সখনও কামানও দাগে।

'পমুড়া' মানে যুবা। কিন্তু ওলন্দাজ শিবিরবাসীর কাছে পমুড়া মানে গুন্ডা, বদমায়েস, চোর, ডাকাত—যেমন ছিল আর্য অভিধানে অনার্য শব্দের অর্থ। শিবিরের ওলন্দাজ মায়েরা ছেলেদের পমুড়ার ভয় দেখিয়ে পোষ মানায়।

ওলন্দাজ ক্যাম্পের বিভীষিকা থেকে পালিয়ে এসে পরিত্যক্ত শহরের পথে পথে ঘুরি। সারি সারি ছবির মত বাংলা বাড়ি—কেউ থাকে না তাতে, না ইন্দোনেশীয়, না ওলন্দাজ। রাত্তিরে নাকি পমুড়ারা ওখানে আসে।

এক একটা বাড়ি প্রকাণ্ড, থম্ থম করে, রূপকথার দৈত্যপুরীর মত। অফিসারেরা বলে, "নিরাপদ নয়—দুদিন আগে ওগুলো পমুড়াদের দখলে ছিল। এখনও হয়ত কোণায়কাঞ্চিতে কেউ লুকিয়ে আছে, মওকা পেলেই গুলী মারবে। ওখান দিয়ে যেতেই যদি হয় সাবধানে যেও।"

পথে পথে রাশি রাশি ঝাউ আর শিশু গাছ, আর সব পথের শেষে, সব কিছুকে ছাপিয়ে—দূরের নীল পাহাড়।

মেসে গেলাম দুপুরের খাওয়া খেতে। অর্ধেকের বেশী অফিসর গরহাজির। কেউ রোঁদে বেরিয়েছে, কেউ ঘরে ঘুমুচ্ছে। মেসে যে দু একজন ব'সে আছে তাদেরও ঘন ঘন হাই উঠছে।

খাবার টেবিলে আমরা মাত্র দুটি—আমি এবং বিশালকায় একটি ক্যাপটেন। খেতে খেতে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। সে বললে :—

"আমাকে কিছু শুধিও না বাপ, আমি কিচ্ছু জানি না। আমার কাজ হচ্ছে যা পারি গুছিয়ে নেওয়া। সুরাবায়ার লড়ায়ের সময় এক বাড়িতে ঢুকে একখানা রেফ্রিজরেটর হাতিয়েছিলাম, সন্তর্পণে প্যাক ক'রে সেটিকে দেশে পাঠিয়েছি। বান্দুংএ পেয়েছি একটি বাক্স, চীনে কারিগরের হাতের। কী তোফা কাজ আর কী বিরাট সাইজ। মাল প্যাক করা হয়ে গেছে—জাপানীদের দিয়ে করিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন, ওটাকে পার করি কী প্রকারে? স্থলপথ বন্ধ, উড়োজাহাজেও ওকে নেবে না, যতই ঘুষ কবুল করি। বড় ফ্যাসাদে পড়েছি।"

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, "খবর ভালো। রাস্তা শীগ্‌গিরই খুলবে।"

ক্যাপটেন—পরে জানলাম তার নাম ম্যাকফীয়ার্সন, সংক্ষেপে ম্যাক্‌—বললে, "আমি তো উল্টো শুনছি।"

আমি বললাম, "বাজে গুজব। আমি খাঁটি খবর বলছি। একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। আমাদের কর্তারাও রাজী, ইন্দোনেশীয়ও রাজী।"

ম্যাক বললে, "কী জানি বাপু, আমি তো শুনেছিলাম—যাকগে যাই হোক ফাঁড়াটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি।"

একগাদা অফিসর হঠাৎ সশব্দে মেসে ঢুকে পড়ায় শোনা হ'ল না ম্যাক কী শুনেছিল। খাওয়া শেষ ক'রে সে বারান্দা থেকে একখানা প্রমাণ সাইজের রাইফ্‌ল্‌ তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমিও তার সঙ্গ নিলাম।

ম্যাক বললে, "পিস্তল ছাড়—ওতে কী হয়? এ বান্‌দুং, ওসব অফিসরী চাল এখানে চলবে না। নিশ্চিন্ত মনে রাস্তায় চলেছ, হঠাৎ দেখবে বোঁ ক'রে একটা গুলী তোমার মগজ ফস্কে বেরিয়ে গেল। গুলী ছুঁড়ছেন এক ইন্দোনেশীয় স্যাঙাৎ একশো গজ দূর থেকে—সে তোমার অফিসরী পিস্তলকে থোড়াই ডরায়। এই রকম কোঁৎকা রাইফ্‌ল্‌ সঙ্গে থাকলে তবে স্যাঙাৎ সামলে চলবে—পাল্টা জবাবের ভয়ে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গুলী-গোলা বুঝি এখানে নিত্যিই চলে?"

ম্যাক বললে, "তাই তো শুনি। সত্যি মিথ্যে জানিনে বাপু, আমাকে জেরা কোরো না। তবে সাবধানের মার নেই।"

জাপানী আড্ডায় গেলাম। দেখলাম, সত্যিই ওরা দিব্বি আছে। চুপচাপ খাচ্ছে-দাচ্ছে আর মিত্র সৈন্যদের ফুট ফরমাস খাটছে। বিস্তীর্ণ ক্যাম্প, পাকা দালান—তকতকে ঝরঝরে, ফুরফুরে হাওয়া। কোথাও বন্দিত্বের চিহ্নমাত্র নেই।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকলাম মনে হলো কলকাতার কোনো মার্চেণ্ট আপিসে ঢুকেছি, বড় সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে। ছিম-

ছাম সাজানো গোছানো দপ্তর, চকচকে পালিশ করা টেবিল, তার ওপর ঝকঝক করছে অফিসারের নাম—জাপানী আর ইংরেজী হরফে। লোককে খুঁজতে এসে অযথা সময় নষ্ট করতে হয় না।

লেফ্টেনাণ্ট উএদা নামে একটি লোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। দু-চারটি কথায়ই মালুম হ'ল মানুষটি শরীফ, তবে কিসের একটা তাগিদে উসখুস করছে। শুধোলাম।

শুনলাম, এদিকে জাপানীদের যত বড় বন্দীশিবির, তার চেয়ে অনেক বড় একটা বন্দী শিবির আছে রেল লাইনের ওদিকে, ইন্দোনেশীয় এলাকায়। ব্রিটিশ ব্রিগেডের সঙ্গে তাদের সোজা পথে কোনো যোগাযোগ নেই, কারণ ইন্দোনেশীয়দের সঙ্গে ব্রিটিশ-দের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। জাপানীরা নিজেরাই রাখে যোগাযোগ—এদিককার জাপানী হেডকোয়ার্টার থেকে লোক যায়, ওদিককার জাপানী ক্যাম্পের তত্ত্বাবাস করে। আজ দিন পড়েছে, আর খবর নিয়ে আসবার ডিউটি পড়েছে উএদার।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, "সে কি! তোমাকে ব্রিটিশেরা ওপারে যেতে দেয়?

উএদা সবিনয়ে বললে, দেয়।

"আর ইন্দোনেশীয়রা? তারা তোমার মুণ্ডু কাটে না?"

উএদা বললে, "আমাদের কাছে ইন্দোনেশীয় ছাড়পত্র আছে। মাঝে মাঝে ইন্দোনেশীয়েরা গাড়ী তল্লাসী করে, আপত্তিজনক কিছু না পেলে ছেড়ে দেয়।"

আজীব ব্যাপার। এই দুদিন আগে জাপান ছিল মিত্রদলের দুর্ধর্ষ শত্রু—কত সৈন্য তাদের জাপানীদের হাতে মারা গেছে। জাপানীও কম মরেনি তাদের হাতে। তবু এদের দুদলের মধ্যে কোনো-রকম খিটিমিটি নেই। ইন্দোনেশীয়েরাও এই সেদিন এই জাপানীদেরই হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে, দু-তিনটে ছোট-বড় লড়াইও হয়েছে তাদের মধ্যে। তাদেরও মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। গোলমাল এখানে শুধু ব্রিটিশ আর ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে—আর জাপানীরা দিব্বি নিরপেক্ষ হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে! সূক্ষ্ম বটে ধর্মের গতি।

হঠাৎ মাথায় শনি চাপল। বললাম, ''মিস্‌টর উএদা!''

উএদা বিনয়াবনত হয়ে একটা সৌজন্যসূচক জাপানী ধ্বনি উচ্চারণ করল। আমি বললাম ঃ—

''মিস্‌টর উএদা, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?''

উএদা বললে, সে খুবই রাজী, তবে সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈনিক ইন্দোনেশীয় সরকারের অনুমতি না নিয়ে লাইনের ওপারে গেলে একটা ফ্যাসাদ বাধতে পারে।

আমি বললাম, ''কে ব্রিটিশ সৈনিক? আমার বাড়ী বাঙলা দেশে, যার সঙ্গে ইংরেজের লড়াই শুরু হয়েছে ১৭৫৭ সালে, আজও থামেনি। আর অস্ত্র? সে আমি এত সঙ্গোপনে লুকিয়ে নিয়ে যাবো যে ইন্দোনেশীয়া ঝেঁটিয়ে গোয়েন্দা জড়ো করলেও কেউ তার সন্ধান পাবে না।''

উএদা সভয়ে বললে, ''না না, তাতে একটা বিশ্রী রকমের ব্যাপার ঘটতে পারে। জানো তো সুরাবায়ার ব্রিগেডীয়ার ম্যাল্যাবীর কথা! তিনিও গিয়েছিলেন ইন্দোনেশীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, নিরস্ত্র হয়ে। তাঁর গাড়ীর সীটের তলা থেকে বেরোলো স্টেন্ গান,—''

—''এবং তিনি প্রাণ হারালেন। ওসব তত্ত্বকথা আমাকে শুনিও না, আমি জাকার্তার লোক, ওসব আমার জানা আছে। আমি যাচ্ছি খালি হাতে—ব্রেন, স্টেন, মাউজার, অটোম্যাটিক কিচ্ছু আমার সঙ্গে যাবে না। আমি যে জিনিস নিচ্ছি সেটি বাঙালীর নিজস্ব এবং মোক্ষম মারণাস্ত্র। দেখবে সে বস্তু? তবে দেখ—''

অর্জুন সারথিকে স্মরণ ক'রে মুখব্যাদান করলাম।

''প্রথম ফাঁড়াটা নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। সশরীরেই চৌকাঠ ডিঙিয়ে ইন্দোনেশীয় এলাকায় ঢুকে পড়লাম।

ব্রিটিশ সীমানার হাত পঞ্চাশেক দক্ষিণে এক পাল ইন্দো-

নেশীয় ছোকরা দাঁড়িয়েছিল। হাতে বন্দুক সবারই, পরনেও সামরিক উর্দি, কিন্তু কারো এক রোঁয়া গোঁফ গজায়নি। একটি ছোকরা ওরই মধ্যে একটু লীডার গোছের. সে হাত তুলে কি একটা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার রাসভ বিনিন্দিত "মর্‌দেকা" গর্জনে সে থমকে গেল—সেই সুযোগে আমাদের গাড়ী ঢুকে গেল।

"মর্‌দেকা" মানে স্বাধীনতা, স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার ছেলে-বুড়ো সবার বুলি। পথে-ঘাটে দেখা হলে মর্‌দেকা, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম সম্ভাষণে মর্‌দেকা, রেলস্টেশনে বিদায়ের আগে মর্‌দেকা, দোকানের নাম মর্‌দেকা, হোটেল-রেস্তোরাঁর নাম মর্‌দেকা—আকাশে-বাতাসে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র 'মর্‌দেকা'। গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলেমেয়েদের আবার আরেক সুর চড়া, "ততাপ্‌ মর্‌দেকা!" অর্থাৎ "চিরস্বাধীন"।

একবার কথাটার ব্যুৎপত্তির খোঁজ করেছিলাম একটি ইন্দোনেশীয় পণ্ডিতের কাছে। পণ্ডিত মুসলমান, নাম শ্রীপূর্বচরক, সংস্কৃতে ডি, ফিল্‌. হলাণ্ডের লাইড্‌ন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে মুখ গম্ভীর ক'রে বললেন,

"সারা ইন্দোনেশিয়ায় কেউ জানে না। জানবে কোত্থেকে, ঐতিহ্যটিকে গুলে খেয়ে দিয়ে বসে আছে যে! যত স্বদেশীওলারা সব লুকিয়ে লুকিয়ে ওলন্দাজ মেশানো ভাষায় কথা বলে, আর সভায় বক্তৃতার সময় ন্যাকা ন্যাকা সুরে "খাঁটি বাহাসা ইন্দোনেশিয়া" আওড়ায়, তাতে থাকে অজস্র ব্যাকরণের ভুল, আর বিভক্তি প্রত্যয়ের তো বালাইই থাকে না। সংস্কৃতের কথা ছেড়েই দাও! আমাদের যবদ্বীপে, যেখানে অধিকাংশ লোকের তৎসম তদ্ভব সংস্কৃত নাম, সেখানেও আজকাল সংস্কৃতের চর্চা উঠে যাচ্ছে তো অন্যে পরে কা কথা। কাউকে বলি না এ সব কথা—কাকে বলব, খামকা ভস্মে ঘি ঢালা!—তুমি এসেছ সংস্কৃতের জন্মস্থান ইণ্ডিয়া থেকে, তাই তোমাকে বলছি। হ্যাঁ, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে মর্‌দেকা শব্দের ব্যুৎপত্তি; মর্‌দেকা হ'ল অপভ্রংশ, 'মহর্দ্ধিকা' থেকে । মহা+ঋদ্ধি,

মহর্দ্ধি, তা থেকে মহর্দ্ধিকা—মহাসম্পদ। তা স্বাধীনতার চেয়ে বড় সম্পদ কি আর আছে? তাই স্বাধীনতা হ'ল মর্‌দেকা।''

প্রথম ফাঁড়িতে মর্‌দেকা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মরণ এড়ালাম। ছোঁড়াগুলো চমকের প্রথম ধমকটা সামলে উঠতেই বুঝল আমি বন্ধুলোক। একে রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তায় মুখে মর্‌দেকা বুলি, এ লোক বন্ধু না হয়ে যায় না। লীডার ছোকরা একগাল হেসে বললে, ''ইণ্ডিয়া ইন্দোনেসিয়া সামা-সামা''—অর্থাৎ আমাদের দেশ দুটি সমপদবাচ্য, স্যাম্ স্যাম্, এক গোয়ালের গরু।

আমি দু হাত জুড়ে বললাম, ''ততাপ্—চিরকাল''।

ছোকরার দল কেউ হেসে, কেউ গর্জে জবাব দিল, ''ততাপ্ মর্‌দেকা!''

গাড়ী চলল সুড় সুড় ক'রে।

সঙ্গে যাত্রী দুটি—জাপানী, লেফটেনাণ্ট উএদা আর গাড়ীর ড্রাইভার। ড্রাইভারও উর্দিপরা সৈন্য। উএদার মুখের দিকে একবার চাইলাম—কোনো রকম ভাব-লক্ষণ নেই সে মুখে। বুদ্ধ-মূর্তির মত চাঞ্চল্যরহিত। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে সে খুশী হ'ল কি বিরক্ত হ'ল তা তার মুখ দেখে আন্দাজ করা গেল না।

গাড়ী চলল বান্‌দুং-এর বাজার ঘেঁষে। নামেই বাজার, দোকানপাট শূন্য। এক দোকানের নাম 'তোকো বোম্বাই'—নির্ঘাত শৌখীন কাপড়ের দোকান। বোম্বাই-এর লোক বলতে ইন্দোনেশিয়ায় সিন্ধীদের বোঝায় এবং সিন্ধীদের প্রায় একচেটে ব্যবসা হ'ল রেশমী কাপড় বিক্রী। কিন্তু এ 'তোকো বোম্বাই'এ সিন্ধী দোকানদারও নেই, রেশমী পশমী কাপড়ও নেই, আছে শুধু ভাঙা কাচ আর মাকড়সার জাল। সুন্দদেশের সেরা শহর বানদুং-এর বাজার, কত রঙ-বেরঙের কাপড় তার দোকানে দোকানে ঝলমল করবে—কিছুই নেই। ওলন্দাজ নৌবাহিনী ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে অষ্টপ্রহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, বাইরের জিনিস ইন্দোনেশিয়ায় ঢুকতে দেবে না, ইন্দোনেশিয়ার জিনিস বাইরে বেরুতে দেবে না। শুধু কাপড় কেন, চটের ছালার আমদানীও বন্ধ।

এক একটা দোকান শকুনে-খাওয়া জন্তুর মাথার খুলির মত ফাঁকা—দরজা নেই, দরজার চৌকাঠ নেই, দেওয়ালে সারি সারি তাকের খাঁজ কাটা, তাতে তক্তা নেই। সব চেলা ক'রে ফেলা হয়েছে। ওলন্দাজ জাহাজগুলো এক ঝুড়ি কয়লা দেশে ঢুকতে দেয় না—ট্রেনগুলোও চলাচল করে কাঠ পুড়িয়ে।

হোটেল অঞ্চলে এসে পেঁছিলাম। বিরাট হোটেল "প্রিয়াঙার," কালে রাজপ্রাসাদও বুঝি তার কাছে হার মানতো, এখন তার কঙ্কালটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধের সময় জাপানীরা তার ধপধপে সাদা দেহটাকে ধোঁয়াটে মেটে রঙের আস্তরণে ঢেকে দিয়েছিল, উড়োজাহাজকে ফাঁকি দেবার জন্য—সে রঙ তার আজও ঘোচেনি। হোটেল "জাভা", হোটেল "বান্দুং", তাদেরও রূপ মেটে সবুজ বহুরূপীর মত।

দু-একবার ইন্দোনেশীয় সান্ত্রী আমাদের গাড়ী থামাল; ছাড়পত্র দেখে আবার ছেড়ে দিল। আমি দু-একটা ইন্দোনেশীয় কথা বললাম, সান্ত্রীরা খিলখিল হাসতে লাগল। একজন আমাকে দেখিয়ে বলল, "গুর্খা"। আমি আপত্তি ক'রে বললাম আমি বাঙালী। সে থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল "গুর্খা দারি বঙ্গাল" অর্থাৎ বাঙালী গুর্খা? এবারে এল আমার হাসবার পালা। পরে বুঝলাম ওদের ধারণা গুর্খা মানে ভারতীয় সৈন্য।

শহর ছেড়ে জাপানী ক্যাম্পের রাস্তা ধরলাম। টানা রাস্তা, কোথাও কাঁটাতারের বেড়া নেই, পথ গিয়ে মিশেছে দূরের পাহাড়ে। স্তরে স্তরে ঢেউ-এর মত নীল পাহাড়, সুন্দ হাসির ঢেউ-এর মত, প্রাণখোলা হাসির ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

পাহাড়ের দিকে চেয়ে উএদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ রাস্তা কোথায় গেছে?"

উএদা বললে, "গারুট্"।

জাপানী ক্যাম্পে পেঁছিলাম এগারোটা নাগাদ। উএদা গাড়ী থেকে নেমে আমাকেও নামতে অনুরোধ করল, এক বিঘত নুয়ে।

আমরা নমস্কার করি হাত তুলে। জাপানীরা নমস্কার করে

কোমর দিয়ে। কাকে কতখানি নুয়ে নমস্কার করতে হবে সেটা জানা জাপানী সৈনিকের অবশ্য কর্তব্য। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অভিবাদনে যে জ্যেষ্ঠ সেও সামনে নুয়ে নমস্কার করবে, যে কনিষ্ঠ সেও, তবে পাত্রভেদে মাত্রাভেদ—যে বড় সে ঝুঁকবে অল্প, যে ছোট সে ঝুঁকবে বেশী। ঝুঁকে পড়েও কনিষ্ঠকে নজর রাখতে হবে যেন তার অবনমনের মাত্রা জ্যেষ্ঠের চেয়ে যতখানি বেশী হওয়া উচিত সেই পরিমাণের কম না হয় এবং সে যেন জ্যেষ্ঠের আগে তার অভিবাদন শেষ না করে।

যদিও আমি তখনও-পরাধীন এক দেশের সামান্য সৈনিক, তবু উএদার সৌজন্যের দাঁড়িপাল্লায় আমার ওজন বেশী, কারণ আমি আমি নয়, আমি সেই শক্তির একজন প্রতিনিধি, যে-শক্তির কাছে তার সম্রাট—যাঁর সান্নিধ্যে এলে সমস্ত জাপান সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, যিনি দেবী আমাতেরাসু মিনামির বংশধর, যাঁর নিজস্ব নাম তখনও জাপানে কেউ উচ্চারণ করে না, সামুরাইদের সাক্ষাৎ ভগবান সেই সম্রাট—আত্মসমর্পণ করেছেন; কেন করেছেন কে জানে, তাঁর লীলা অপার, কে বুঝবে কি কারণে অজেয় জাপান কতকগুলো বিদেশী বর্বর কাপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, কারও সাধ্য নয় এ দৈবরহস্য ভেদ করা, একমাত্র জানেন দেবী আমাতেরাসুর সন্তান সম্রাট শোওআ।

আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে উএদার নমস্কারের জবাব দিলাম, নইলে হয়ত সে ঝাড়া দশ মিনিট ঝুঁকে পড়ে চোখ কপালে তুলে আমার প্রত্যভিবাদনের অপেক্ষায়, দাঁড়িয়ে থাকতো। উএদা সোজা হয়ে আবার ঝুঁকে ক্যাম্পের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "দো'জো" অর্থাৎ আস্তাজ্ঞে হোক্।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না বন্ধু, আবার কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে ঢুকছি না। আমি জানি জাপানী ক্যাম্প সাতিশয় ছিমছাম, পথের ধারে ধারে ছোট্ট গাছ আর ফুল, ঘরে ঘরে বাঁশপাতার অপরূপ ছবি—কিন্তু তবু সে ক্যাম্প। আমি বাইরেই আছি, দিব্বি থাকবো, তুমি তকল্লুফ কোরো না, নিজের কাজ সেরে নাও।"

উএদা বলল, ''কিন্তু আমার বেশ একটু দেরি হবে—এক ঘণ্টার ওপর।''

আমি বললাম, ''তা হলে আমি একটু ঘুরে বেড়াবো। তোমার গাড়ীটা পাওয়া যায় গাড়ীতে, নচেৎ পায়ে হেঁটেই।''

বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উএদা বললে, ''গাড়ী অবশ্যই পাওয়া যাবে, ড্রাইভারই নিয়ে যাবে। কিন্তু একা একা তোমার পক্ষে ঘোরা কি ঠিক হবে?''

আমি বললাম, ''ক্যাম্পে আমি ঢুকব না, অতএব হয় আমায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নয় ঘুরে বেড়াতে হবে। বাইরে যদি দাঁড়াই বেশীক্ষণ—পাহাড়ের মোহিনী মায়া আমাকে টেনে নিয়ে যাবে গারুটে। সে কি ভালো হবে? তার চেয়ে শহরের পথে পথে ঘোরাই ভালো।''

উএদা ভীতমুখে সসৌজন্যে বললে, ''হা''।

খানিকটা সময় দিব্বি কাটল। হাতে ইন্দোনেশীয় পয়সা ছিল তাই দিয়ে কফি কিনলাম, পাঁপড়ের মত মুড়মুড়ে ''ক্রুপু'' খেলাম, এর ওর সঙ্গে হাসিমস্করা করলাম। একজন ছোকরার কোল্ট অটোম্যাটিক পিস্তল জাম্ হয়ে গিয়েছিল, মেরামত ক'রে দিলাম, সে খুশী হয়ে ম্যাণ্ডোলীন বাজিয়ে আমাকে শুনিয়ে দিল নতুন গান ''হালো বান্দুং!''

কী মিঠে গলা! আর শুধুই কি সেই ছেলেটির? যেই ছোকরা গান ধরলে আশপাশ থেকে গণ্ডাচারেক ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল—সব কটার তৈরী সুরেলা গলা। গানের কথাগুলো ভালো মনে নেই, কিন্তু তার চন্‌মনে মনদোলানো সুরটা এখনো ভুলিনি। গানটা বাঁধা প্রিয়াঙার ভূমির জননী বান্দুংকে উদ্দেশ ক'রে—নির্বাসিতের গান। ধুয়ো হচ্ছে, ''মারি বুং কম্‌বালি!'' অর্থাৎ এস ভাই যাই ফিরে—নির্বাসিত জনের আবেদন।

মনে পড়ল, আমাকেও ফিরতে হবে—দেশে নয়, সে তো অনেক দূরের কথা, ভবিষ্যতে। বর্তমানে ফিরতে হবে, এই মুক্ত বাতাস আর সুন্দ হাসি ছেড়ে ওপারের পিঞ্জরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তিন-

চারবার মর্দেকা শপথ ক'রে গাড়ীতে চড়লাম। মনে মনে বললাম, 'চললো গাড়ী লালবাজার'।

খানিকক্ষণ বাদে নজরে পড়ল গাড়ী গোলকধাঁধার মত একই চক্করে বার বার ঘুরছে। ড্রাইভারকে শুধোলাম কী ব্যাপার। সে জাপানী আর ইন্দোনেশীয় মিশিয়ে যা বলল তার অর্থ, সে পথ হারিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "গাড়ী থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করো না কেন?"

ড্রাইভার সভয়ে বললে, "ইন্দোনেশীয় সামরিক পুলিস এলাকা—মাতা মাতা মুসু—খ্ল্ক্—"

"মাতা মাতা মুসু"র আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে "চোখ চোখ শত্রুর," অর্থাৎ গুপ্তচর। আর "খ্ল্ক্" হচ্ছে তলোয়ারে গলা-কাটার শব্দের অনুধ্বনি। ড্রাইভারের কথার মর্ম হ'ল এই যে আমরা ভুলক্রমে এমন একটা এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছি যেখানে ইন্দোনেশীয় পুলিসের বিশেষ অনুমতি ছাড়া ঢোকা বারণ। গাড়ী থামিয়ে কাউকে রাস্তা জিজ্ঞেস করলে সে বুঝে নেবে যে, আমরা নতুন লোক, তার মানে গুপ্তচর। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গলা কাটার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতএব নিজেদের চেষ্টায় পথ খুঁজে বার করবার পন্থাটিই শ্রেয়।

আরও জেরা ক'রে জানলাম যে, যে-ছাড়পত্রের বলে জাপানী গাড়ীখানা ইন্দোনেশীয় চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকেছে সেটাও আছে লেফটেনাণ্ট উএদার কাছে। সুতরাং পুলিশের কবল থেকে ছাড়ান পাওয়ার মত বিশেষ অনুমতি তো আমাদের হাতে নেই-ই, একখানা এমনি ছাড়পত্রও নেই যার দ্বারা খোলা তলোয়ারকে এক মুহূর্তও রুখে রাখা যেতে পারে।

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, "ঘাবড়াচ্ছ কেন? একটু বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে বললেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে—ছেড়ে দেবে।"

ড্রাইভার সজোরে মাথা নেড়ে বললে, ''উঁহুহুঃ—সামরিক পুলিশ নির্মম—খুলুক—''

ফাঁদ থেকে বেরোবার আরো দু' দফা চেষ্টা করার পর আমাদের গাড়ী পড়লো ধরা জালে। একটি ছোকরা ইন্দোনেশীয় অফিসার দুটি ষণ্ডামার্ক সেপাই নিয়ে পাহারায় ঘুরছিল, সে আমাদের হাত তুলে গাড়ী থামাতে বলল।

ড্রাইভার গাণ্ডীবের মত পুষ্ট এক জোড়া ভুরু কপালে তুলে বিড় বিড় ক'রে বলল, ''ইনি আতাওআ উএদা সান্-খুলুক্!'' অর্থাৎ হয় ইনি নয় শ্রী উএদা, এর দুজনের একজনের হাতে তার জীবনের অবসান অবধারিত। যদিবা এঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, গাড়ী লেট করবার জন্য উএদা সায়েব তার হাতে মাথা কাটবে। সে মারীচ।

আমি বললাম, ''হেঃ! অজাতশ্মশ্রু এক ছোকরা, সে কাটবে আমাদের গলা? কালে কালে কতই শুনব—''

অজাতশ্মশ্রু লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে এল।

বেশ দেখতে ছেলেটি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, টানা চোখ, ধনুকের মত ভুরু, সুন্দদেশের পুতুলনাচের অর্জুনের মত। নাক খাঁদাও নয়, অনাবশ্যক টিকোলোও নয়, কতকটা আমাদের দেশের হিমাচল প্রদেশের রাজপুত্তুরদের মত আন্দাজমতন এবং শৌখীন ধাঁচের। মুখখানা অশথপাতার মত—চোখের কাছটা চওড়া, থুতনিটি সুরু। ঠোঁট দুখানা পাতলা, ফুলের পাপড়ির মত। রঙটা বোধ হয় ফর্সাই, রোদে পুড়ে পদ্মমধুর বর্ণ ধরেছে।

ছোকরা ভারিক্কি চালে আমার দিকে হাত বাড়াল।

আমিও হাত বাড়ালাম, নাটকীয় কায়দায়। আবৃত্তি শুরু করলাম, বিশুদ্ধ বাঙলায়—

''বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম—''

হয়ে অফিসারটি বললে, "পাস?"

আমি দু' হাত নেড়ে বললাম, "নেই। শুধু গান আছে কণ্ঠে তারি ভরসায় চড়েছি পারের খেয়ায়।"

নির্বিকার অফিসার। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললে, "এটা নিষিদ্ধ এলাকা, বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া এখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তোমাদের কাছে আছে অনুমতিপত্র?"

আমি চট ক'রে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার ফোটোসম্বলিত পরিচয়পত্র দেখালাম।

অফিসার দেখে বললে, "ও তো ব্রিটিশ পরিচয়পত্র। আমরা চাই ইন্দোনেশীয় সামরিক পুলিসের সই-করা বিশেষ অনুমতিপত্র। দেখাও!"

আমি বললাম, "কী ক'রে দেখাই ভাই, নেই যে! আমি রবাহূত, নিমন্ত্রণপত্র পাইনি, শুধু তোমাদের নীল পাহাড়ের ডাকে চলে এসেছি—এক বস্ত্রে। একটুও ইচ্ছে নেই ওপারের পাপ-ক্যাম্পে ফিরে যেতে কিন্তু কী করি, যেতে হবেই।"

আমার কথায় কান না দিয়ে অফিসারটি ড্রাইভারের সঙ্গে জাপানী ভাষায় কথা বলতে লাগল। জাপানী ভাষা এমনিই শুনতে বেশ, তার ওপর যদি সুন্দ গলার মধু তাতে ঢালা হয়, তবে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায় বল। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি শুনতে লাগলাম। কিন্তু ড্রাইভার অতিমাত্রায় ভীত হয়ে উঠল।

আমার মন তখন বাৎসল্য-রসে ভরপুর। বললাম, "অফিসর ভাই, ও গরীব ব্যক্তি, ওকে কষ্ট দিও না। ও এখানে আসতে চায়নি, আমিই ওকে জোর ক'রে এখানে টেনে এনেছি। গলা কাটতে হয় আমার গলা কাটো, ওকে রেহাই দাও!"

মনে ভেবো না খোকাটি খালি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—মোটেই নয়। এখানকার ছুরি-কাঁচি-চাবিওলারা যেমন সর্বাঙ্গে অষ্টধাতুর নমুনা ঝুলিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ঘুরে বেড়ায়, ইন্দোনেশিয়ার এই অর্জুনটির আয়ুধসজ্জাও প্রায় তেমনি। তার বাঁ পাশে ঝুলছিল ইয়াব্বড়া এক জাপানী সামুরাই তলোয়ার, ডান পাশে প্রমাণ সাইজের

একটি পিস্তল, কোমরবন্ধ থেকে ঝোলানো। বাঁ কাঁধে রাইফল্—সন্দেহজনক—ব্রিটিশ লী-এনফীল্ড রাইফল্—হয় আমাদের কোনো জওয়ানের কাছ থেকে কোনো কায়দায় বাগানো, কিংবা হতাহত কোনো ব্রিটিশ সৈন্যের কাছ থেকে তুলে নেওয়া। ডান কাঁধে একটি জাপানী সাব্-মেশীন গান্—স্টেন গোত্রীয়। এ ছাড়া সঙ্গীন, খুচরো দু'-একখানা ছোরাছুরি—এসব তো ছিলই। পায়ে কুষাণ সৈনিকের মত জানুচুম্বী চামড়ার বুট, মাথায় স্টীল হেল্মেট। বাড়াবাড়ি! এত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জোয়ান মদ্দেরই চলাফেরা করা শক্ত, আর এ তো কিশোর শিশু।

অফিসার দৃঢ়স্বরে বললে, "চলো আমাদের হেডকোয়ার্টারে।"

আমি বললাম, "না না, অত কেন? এইখানেই তো বেশ হচ্ছে, আবার দৃশ্য পরিবর্তন কেন? একটু জমুক।"

অফিসার আরও কড়াসুরে বললে, "তোমাদের ছাড়পত্র নেই, অনুমতিপত্র নেই, তোমরা নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকেছ, আইনভঙ্গ করেছ। আমি তোমাদের বন্দী করলাম। নাবো গাড়ী থেকে, চলো মার্চ ক'রে সামরিক পুলিশ হেডকোয়ার্টারে! তোমাদের গাড়ী আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।"

আমি বললাম, "পাপের বেতন মৃত্যু। হোক্ মৃত্যু—এখানেই, এই উন্মুক্ত আকাশের তলায়। যদি স্বর্গে যাই, যাবো দূরের ঐ নীল পাহাড় দেখতে দেখতে। বলবো, মায়াবিনী, তোর ডাকে, তোর কুহকেই আমার মরণ হ'ল—'তেরে লিয়ে সামালিয়া'।"

রাগে অফিসারের মুখ নীল হয়ে গেল। সুর সপ্তমে চড়িয়ে সে বললে, "হেডকোয়ার্টারে এখুনি যাবে কিনা বলো!"

আমি বললাম, "না বন্ধু আমার, যাবো না। তোমাদের মিলিটারী পুলিশের বড় বদনাম। হয়তো তারা আমাকে অন্ধকার কুঠুরীতে বন্ধ ক'রে দেবে, আরশুলার সঙ্গে সহবাস করতে হবে—সে আমি পারব না, আমি বড় ভয় পাই আরশুলাকে। হয়তো ভোর রাত্রে আমাকে ডেকে তুলে আমার চোখ বেঁধে ভোঁতা কুড়ুল দিয়ে ঘাতক আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবার চেষ্টা করবে, সারা জীবন আমার অঙ্গে খুঁত থেকে যাবে। কেন বন্ধু ওসব তকলিফ দেওয়া মাসুম

বেরাদরকে। এই বেশ, বার করো তোমার পেয়ারা শম্‌শের, এ বাঙালী গলা, ষাঁড়ের গর্দান নয়, তোমার কচি হাতে ব্যথা লাগবে না।"

অফিসার ভীষণ চটে গিয়ে সজোরে মাটিতে এক লাথি মারল। লাথির চোট তার দশপ্রহরণে ঝঞ্জনা লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম বেরোলো—

"এখুনি নাবো গাড়ী থেকে! চলো হেডকোয়ার্টার!"

আমিও গাড়ীর মেঝেয় বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি লাথি কষে বললাম—

"নাব্‌ব না! চলবো না!!"

এইবারে ষণ্ডা সাঙ্গোপাঙ্গ দুটি এগিয়ে এল আমাকে জোর ক'রে গাড়ী থেকে নামাতে। আমি তাদের দিকে চোখ পাকিয়ে বললাম, "খবদ্দার! সামাল্‌কে। ইণ্ডিয়া-ইন্দোনেসিয়া সামা-সামা। আমার গায়ে হাত তুললে বুং কার্নো তোমাদের পিঠের চামড়ায় ডুগডুগি বাজাবেন। তফাৎ যাও!"

বুং কার্নো প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণর আদরের ডাকনাম, ছেলেবুড়ো রসবশে তাঁকে এই নামেই ডাকে।

ষণ্ডা দুটো একটু থমকে অফিসারের মুখের দিকে চাইল, বোধ হয় আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু সে-আদেশ এল না। অপরের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহী জনকে বশে আনতে হয়তো অফিসারের আত্ম-মর্যাদায় বাধল। ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল তাকে হেড-লাইনে বলে 'অচল অবস্থা'।

দস্তুরমত বিব্রত হয়ে অফিসার মাথার স্টীল হেল্‌মেটটা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে—বোধ হয় মগজে একটু হাওয়া দেবার জন্য। কিন্তু তাতে যা হ'ল তার ধাক্কায় মুহূর্তে গোটা দুনিয়াটা ওলোট পালোট হয়ে গেল।

স্টীল হেল্‌মেট সরে গিয়ে অফিসারের মাথা থেকে নেমে এল সুপুষ্ট এবং আজানুলম্বিত একটি বেণী!"

বরাট বললে, "ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী ছেলেদের অনেকেই লম্বা চুল রাখে, কিন্তু সে বাবরী; ভুটিয়াদের মত বিনুনী বাঁধার রেওয়াজ ওদেশের ছেলেদের নেই। সুতরাং ঘোরটা কেটে যেতেই বুঝলাম এতক্ষণ যাঁর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছি—"

নিবারণ রুদ্ধশ্বাসে বললে, "তিনি অর্জুন নন্, চিত্রাঙ্গদা?"

বরাট বললে, "হ্যাঁ, তাই বটে।"

পালিত জেরা করলে, "এতক্ষণ একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বললে আর এই সামান্য জিনিসটা তোমার নজরে পড়ল না?"

বরাট বললে, "একটি বারও ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হয়নি যে অফিসারটি একটি মেয়ে।"

পালিত ঠোঁট উল্‌টে বললে, "অবিশ্বাস্য।"

নারাণদা জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা ঘটেছিল কখন?"

বরাট বললে, "হাতে ঘড়ি ছিল না, অতএব আদালতে হলফ করতে পারব না। মনে হয় বেলা তখন আড়াইটে হবে। খট্‌খটে রোদ্দুর।"

নারাণদা জিজ্ঞেস করলেন, "কতটা দূরে দাঁড়িয়েছিল অফিসারটি?"

বরাট বললে, "এখান থেকে—এই রসময় যেখানে বসে আছে অতটা দূর—হাত পাঁচেক হবে, জোর ছ'-সাত হাত।"

পালিত বললে, "সেপাইরা পঞ্চাশ হাত দূরে শত্রুর টিকিটি দেখতে পায় আর তুমি—? য্যা য্যাঃ। তোমার গল্পটি আগাগোড়া স্রেফ গাঁজা।"

বরাট বললে, "নিয়ে এস তামা-তুলসী—ছুঁয়ে বলছি।"

একটু চুপ ক'রে থেকে নারাণদা মন্তব্য করলেন, "বড় কাঠ-খোট্টা লোক হে তুমি বরাট। গন্ধমাদন প্রমাণ এক গল্প চাপালে এক ফোঁটা আদিরস সৃষ্টি করতে। তবে হ্যাঁ, ঘুমটা একদম্ ছুটে গেল—"

নিবারণ বললে, "আঃ, বাজে বকচেন কেন? থামুন না! তারপর কী হ'ল, বলো না বরাট।"

*　　*　　*

বরাট বললে, "তারপর?" তারপর অফিসারের একটি হুকুম আমি তামিল করলাম—গাড়ী থেকে নেবে পড়লাম, একলাফে। লম্বা সেলুট ঠুকে বললাম—

"ভদ্রে, আমাকে ক্ষমা কর।"

অফিসার স্টীল হেল্‌মেট দুরস্ত ক'রে এ'টে বললে, "চলো হেডকোয়ার্টারে।"

স্টীল হেল্‌মেট দুরস্ত হলেও বেণীটিকে আর বশে আনা গেল না। বেণী অফিসারের অঙ্গে আরও একটি সংহারাস্ত্র হয়ে ঝুলতে লাগল, বিচিত্র এক তূণীরের মত।

আমি গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে বললাম, "চলো ভদ্রে!"

কুচকুচে কালো একজোড়া চোখ আমার দিকে ফিরিয়ে ভুরু কু'চকে অফিসার বললে,—

"তার মানে? তুমি আমার বন্দী, তুমি চলবে আমার হুকুমে। আমি তোমার সঙ্গে যাব কেন?"

আমি গেয়ে উঠলাম,—

"অঞ্জন আঁকা আঁখি
সুন্দরী অপরূপা—

তোমার বন্দী? ভদ্রে, শুধু আজ কেন, আজ থেকে চিরকাল আমি তোমার বন্দী। কিন্তু তুমিও বন্দী—আমার মনে, জীবনের শেষ দিন অবধি। কত দিন কেটে যাবে, কত পথিকের আনাগোনা হবে এই হৃদয়ের পথ বেয়ে, কিন্তু তোমার পায়ের দাগ কখনো মুছবে না। ঐ পায়ের ছাপ বুকে নিয়ে গাইব,—

"কবে অঞ্জন আঁকা আঁখি
গেছে সুন্দরী অপরূপা
বন্দিনী ক'রে রাখি
মনোমন্দিরে মনোলোভা—

চলো ভদ্রে, আর এখানে নয়। গারুটের পথে একটি ক্ষুধার্ত উওদা সান্ আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে তুলে নিই। তারপর তুমি যেখানে যেতে বল যাব। তোমার নৃশংস হেডকোয়ার্টারে যেতে বলো, তাও যাব।"

অফিসার বললে, "নিয়ম নেই, পাহারার বীট ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।"

আমি বললাম, "সে কি কথা! তুমি অফিসার, তোমার আবার নিয়ম কী? বাঁধা নিয়ম মানবে সেপাইরা, তুমি অফিসার, তুমি যা করবে তাই নিয়ম।"

বেণী দুলিয়ে অফিসার বললে, "নিয়ম সবাইকেই মানতে হয়।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "সে অন্যদিন, আজ নয়। আজ আমার চিত্ত তোমার বেণীর মতই মুক্ত, আজ অনিয়ম মানাই সুবুদ্ধি। অফিসার, আজ তোমার ছুটি। মমচিত্তমনুচিত্তং তেঽস্তু! সংকুচিত কর তোমার আয়ুধ, হে ভীষণসুন্দর প্রতিহারী, বাজাও কঙ্কণ, ওড়াও অঞ্চল, মুক্ত করো তোমার কেশদাম, দেখি

"ওড়ে অঞ্চল নীল কুঞ্চিত কেশরাশি
হাসে চঞ্চল চোখে শতেক সর্বনাশ
বাজে কংকণ থাকি থাকি—

চোখে দেখছি তোমার ভ্রূকুটি, অন্তর দেখছে তোমার হাসি। সখি, কাব্য চোখে দেখার বস্তু নয়, উপলব্ধির সামগ্রী। রয়েছি বর্তমানে, মিলনের এই প্রথম মুহূর্তে, মন কাঁদছে কোন্ দূরের কাল্পনিক বিরহের কথা ভেবে—

"এই বঞ্চিত মনে সঞ্চিত সুদূরের
সেই খঞ্জন পায় শিঞ্জন নূপুরের
গেছে নিক্কণ ডাকি ডাকি।

কিন্তু বন্ধু, আর ভাববিলাস নয়! এবারে এস, আধ আঁচরে বসো—"

অফিসারের বন্দুক আর স্টেন্ তার দু' কাঁধ থেকে নামিয়ে স্যাঙাৎ দুটির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম। তারপর এক হাতে অফিসারের হাত ও অন্য হাতে তার খাপশুদ্ধ তলোয়ার ধরে তাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজে তার পাশে বসলাম। একটি ষণ্ডা আমার পিছু পিছু ঢুকছিল, তর্জনী তুলে তাকে সুমুখের সীট দেখিয়ে দিলাম, ড্রাইভারের পাশে। বললাম—

"ঐখেনে বন্ধু, পারো তো আরও দূরে। তোমার কোমর থেকে ঝুলছে একটি জলজ্যান্ত হাত-গ্রেনেড্। তোমার পাশে বসা সহ্য করতে পারি কিন্তু বে-আবরু হাত-বোমার গা ঘেঁষে বসতে আমার সংস্কারে বাধে।"

গাড়ী চলল। অফিসার রাগে ফুঁসতে লাগল—

"একেবারে নিয়মবিরুদ্ধ—তোমাদের এখানে আসা নিয়ম-বিরুদ্ধ—আমাদের পাহারার চত্বর ছেড়ে যাওয়া নিয়মবিরুদ্ধ—এ গাড়ী ব্রিটিশ দখলের, এতে আমাদের চড়া নিয়মবিরুদ্ধ—তুমি ব্রিটিশ তাঁবের সৈনিক, তোমার পাশে বসা আমার নিয়মবিরুদ্ধ—অশোভনও, অত্যন্ত অশোভন—"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "ঠিক বলেছ। ড্রাইভার, জাপানী ক্যাম্পে যেও না, চলো গভর্নরের প্রাসাদে।"

আশ্চর্য হয়ে অফিসার বলল, "কেন গভর্নরের প্রাসাদে কেন?"

আমি জবাব দিলাম, "আর বে-আইনী কাজ নয়। গভর্নরের কাছে একটা অনুমতিপত্র চাইতে যাচ্ছি। তুমি ড্রাইভারকে পথ ব'লে দাও।"

গাড়ী গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে গভর্নরের বাড়ীর রাস্তা ধরল। আমি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম—

"তুমি এত ভালো ইংরিজী বলতে শিখলে কোথায়?"

সে জবাব দিলে, "জাকার্তায়—হাই স্কুলে।"

ইন্দোনেশিয়ায় হাই স্কুল মানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নয়, কলেজ। আমি বললাম—

"কিন্তু হাই-স্কুলে-পড়া অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি জাকার্তায়, তাদের ইংরিজী তো এত পরিষ্কার নয়!"

"হাই স্কুল থেকে পাশ ক'রে ডাক্তারী পড়েছিলাম—চার বছর।

'তাই নাকি? তাহলে তুমি ডাক্তার?"

'না। আমাদের কোর্স পাঁচ বছরের।'

"একেবারে শেষ বছরে এসে পড়া ছেড়ে দিলে? কেন, ভালো লাগলো না বুঝি?"

অফিসারের চোখ দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল। সে বললে—

"ছাড়লাম কেন জিজ্ঞেস করছ? জানো না?"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "না। কেন ছাড়লে?"

অফিসার জিজ্ঞেস করলে, "জাকার্তা চেনো?"

"খুব চিনি, সেখান থেকেই তো আসছি।"

"ক্রাভাং যেতে ডান হাতে পর পর তিনটে প্রকাণ্ড বাড়ী পড়ে, দেখেছ?"

"দেখেছি বই কি—মস্ত মস্ত বাড়ী, মেন্তেং-এ যাবার পথটার মোড়ে।"

"ঐখানে ছিল আমাদের মেডিক্যাল স্কুল। এখন সেখানে কী?"

আমি বললাম, "ওলন্দাজ হাসপাতাল।"

অফিসার বললে, "তবু জিজ্ঞেস করছ ডাক্তারী পড়া কেন ছাড়লাম! শখ ক'রে ছাড়িনি—ডাক্তারী পড়তে আমার খুব ভালো লাগত। তোমরা এলে জাকার্তায়, ওলন্দাজেরা জোর ক'রে আমাদের স্কুল দখল করল। ওদের সাধ্য ছিল না আমাদের সেখান থেকে সরায়—কিন্তু স্কুল ঘেরাও করেছিল সঙ্গীনধারী ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্য—তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কারণ তখন আমরা ছিলাম নিরস্ত্র।"

বাকী পথটুকু কাটল নীরবে।

বান্‌দুং-এর গভর্নর দাত' জামিনের খাস কামরার পাশে অভ্যাগতদের ঘর। দুপুর বেলায় ইন্দোনেশিয়ায় দিবানিদ্রার রেওয়াজ, সুতরাং ঘরে দর্শনার্থীর ভিড় নেই, উপস্থিত মাত্র তিনজন—অফিসার, আমি এবং গভর্নরের একজন দেহরক্ষী।

গভর্নর বোধ হয় জেগেই ছিলেন, খবর পেয়ে নিজেই বেরিয়ে

এলেন। বললেন, "আরে, কী ব্যাপার, আগে খবর না দিয়ে একেবারে সুড়ুৎ ক'রে চলে এলে যে! গুরুতর কিছু ঘটেনি তো?"

অফিসার সটান দাঁড়িয়ে উঠে বুটে বুট ঠেকিয়ে চটপট একটি সেলুট দিল। আমিও দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার ক'রে বললাম—

"আজ্ঞে না, আমি এসেছি নিজস্ব একটা দরকারে, সরকারী কাজে নয়। কিন্তু এই অফিসারের কাজটি সরকারী এবং বোধ হয় জরুরী। এঁর কাজ হয়ে গেলেই আমি আমার আরজি পেশ করব।"

গভর্নর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে চাইলেন। সে আরেকটি চটপটে সেলুট ক'রে আনুপূর্বিক সমস্ত বললে; তার সারাংশ এই যে, আমি বিনা অনুমতিতে নিষিদ্ধ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ব'লে সে আমাকে বন্দী ক'রে সামরিক পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি তার আদেশ অমান্য ক'রে তাকে একরকম জোর ক'রেই আমার গাড়িতে তুলে গভর্নরের প্রাসাদে নিয়ে এসেছি। গভর্নরের আজ্ঞা পেলে সে বন্দীকে তার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবে।

গভর্নর হেসে বললেন, "আরে না না, এ আমাদের জানা লোক, কাল আমাদের সঙ্গে এক উড়োজাহাজে জাকার্তা থেকে এসেছে। ছেড়ে দাও একে।"

অফিসারের মুখে ভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হ'ল না। সে শুধু বললে, "আমি যেতে পারি?"

গভর্নর কিছু ব'লে ফেলবার আগেই আমি বললাম, "না স্যর, একে যেতে দেবেন না—দয়া ক'রে—এই আমার আরজি। আমি এর ছবি আঁকব।"

গভর্নর অবাক হয়ে বললেন, "ছবি আঁকবে! এর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন বল দেখি।"

আমি অফিসারের মুখের দিকে চাইলাম। সঙ্গত কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। অন্যমনস্ক হয়ে ব'লে ফেললাম—

"জানিনে স্যর।"

গভর্নর হাঁ ক'রে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ''আমি চাই—ইণ্ডিয়া-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সখ্য, সম্প্রীতি—এর ছবি দেশে পাঠালে—দেখবে লোকে ইন্দোনেশিয়ার মেয়ে—''

গভর্নর বললেন, ''ও, বুঝেছি। তুমি ইণ্ডিয়ার কাগজে এর ছবি ছাপতে চাও। আচ্ছা, সে পরে হবে। আপাতত তুমি আমার ঘরে এসো! জরুরী কথা আছে।''

অফিসার আবার জিজ্ঞেস করলে, ''আমি যেতে পারি? আমার এখন ডিউটি বদলের সময়।''

আমি কাতরস্বরে বললাম, ''স্যর, দয়া ক'রে একটু বসতে বলুন এঁকে। ছবিটা এখুনি যদি হয়ে যায় আজকের ডাকেই পাঠিয়ে দেব। শুভকার্য যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।''

গভর্নর হেসে বললেন, ''তা ডিউটি শেষ ক'রে আসুক না ও। একটু চুলটুলও ফিরিয়ে নেবে সেই সঙ্গে, আর সুন্দ বাতিকের একখানা কাবায়া কাইন প'রে—''

আমি আর্তনাদ ক'রে বললাম, ''না, না, এই বেশেই ভালো, রণবেশে, দশপ্রহরণ হাতে—''

গভর্নর বললেন, ''আচ্ছা তাই হবে। মন্দ নয় আইডিয়াটা, ইণ্ডিয়াতে আমাদের প্রচার একটু দরকার—একটু কেন খুবই দরকার—''

টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে গভর্নর তাঁর খাস কামরায়। কত কী বললেন তার অর্ধেক আমার কানে গেল না। বললেন, ব্রিগেডীয়ারকে তিনি একখানা বিস্তারিত চিঠি লিখেছেন, আমি এসে প'ড়ে ভালোই হ'ল, সে চিঠি তিনি আমার হাতে হাতে দেবেন, আজই পৌঁছে যাবে। চিঠিতে আছে ট্রেন চালানোর জন্য কয়লা সরবরাহের কথা—কয়লা পেলে ট্রেনগুলো আবার চলবে—ক্যাম্পের ওলন্দাজ আর জাপানী বন্দীদের তাড়াতাড়ি চালান দেওয়া যাবে। বান্দুং-এর বাজার আবার খোলবার কথাও তিনি চিঠিতে লিখেছেন—বাজার

খুললে ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যেরা মাংস-আনাজ-তরকারি পাবে, ইন্দোনেশীয়েরা কাপড় পাবে। অনেক বিল বাকী পড়েছে, তার উল্লেখও চিঠিতে আছে—ইন্দোনেশীয়েরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রেখেছে—নিজেরা বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে ব্রিটিশ ক্যাম্পে বিদ্যুৎ বিলি করেছে—চার মাস বিল বাকী পড়েছে—টেলি-ফোন বিলেরও একই অবস্থা—কিছু টাকা না দিলে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক যুগ পরে গভর্নরের বক্তব্য শেষ হ'ল। আমার হাতে ব্রিগেডীয়ারের চিঠি গুঁজে দিয়ে তিনি বললেন, "নাও, চটপট এটা তোমাদের কর্তার কাছে পেঁাছে দাও। আর দেখ, চিঠির জবাবটা যেন তাড়াতাড়ি পাই।"

তারপর তিনি তাঁর একজন পার্শ্বচরকে ডেকে হুকুম দিলেন নির্বিঘ্নে আমাকে ওপারে পেঁাছে দিতে। তারপর করমর্দন এবং "মর্দেকা!"

গভর্নরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে দেখি আমার অফিসার অন্তর্হিত। কামরায় বসে আছে হাসিখুশী একটি মেয়ে, এক ট্রে কফির পাশে। বললে, "বোসো, কফি আনিয়েছি তোমার জন্য।"

আমি অসহিষ্ণুভাবে বললাম, "সেই অফিসার মেয়েটি কই?"

মেয়েটি বললে, "অফিসার মেয়ে? কোন্ অফিসার মেয়ে?"

আমি বললাম, "এই একটু আগেই এখানে যে ছিল—"

মেয়েটি খিল খিল ক'রে হেসে বললে, "অঢেল অফিসার মেয়ে আছে বান্দুংএ। এক ব্যাটালিয়ন মেয়েসৈন্য তো এই শহরেই থাকে, তা ছাড়া আশপাশের নানান্ মেয়ে ব্যাটালিয়নের অফিসাররাও এখানে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করে। তাদের কোন্‌টি একটু আগে এখানে ছিল কী ক'রে বলব? নাম কী? জানো?"

আমি বললাম, "না। শুধু জানি আমি তার বন্দী।"

"বন্দী?"

"হ্যাঁ। বিনা অনুমতিতে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকেছিলাম ব'লে সে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল।"

"গ্রেপ্তার করেছিল? সামরিক পুলিশ অফিসার?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—"

"ওঃ হো, তাহলে সে মিল্—মিলেকে! সামরিক পুলিশে সে ছাড়া আর মেয়ে অফিসার কেউ নেই। বড্ড কঠিন কাজ—পাথরের মত শক্ত হতে হয়। আর দিন নেই, রাত নেই খালি টহল আর ছুটোছুটি। এক মিলেকেই পারে, আর কারো সাধ্যি নেই।"

আমি বললাম, "মিলেকে!"

মেয়েটি বললে, "হ্যাঁ। ভালো নাম মিরিয়ম, ডাকনাম মিলেকে। কিন্তু আজকাল ও নামে ডাকলে আর ও সাড়া দেয় না—বলে মিলেকে ওলন্দাজ নাম।"

"কী নামে দেয় সাড়া?"

মেয়েটি বললে, "প্রিয়াঙ্গী। উদ্ঘুটে নাম, ভালো লাগে শুনতে? আমার বাপু মিলেকে অনেক ভালো লাগে। বলেওছিলাম সে কথা, কিন্তু ও যা গোঁয়ার, কারো কথা কানে তোলে? বলে, ঠিক তো আছে, প্রিয়াঙারের মেয়ে প্রিয়াঙ্গী।' কী মানে ও নামের? জানো তুমি? তুমি তো সংস্কৃত'র দেশের লোক, বলতে পারো?"

আমি বললাম, "পারি। আরো ভালো পারতেন কালিদাস। কিন্তু সে মেয়ে গেল কোথায়? আমি যে তার ছবি আঁকব!"

মেয়েটি বললে, "ছবি আঁকবে? মিলেকের ছবি! ওমা, কি মজা! আমাকে দেবে?"

আমি বললাম, "দেবো। তোমারও একটা ছবি এঁকে দেবো, যদি তাকে ধরে এনে এখানে বসাতে পারো।"

বাচ্চা হরিণের মত তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"হ'ল না প্রিয়াঙ্গীর ছবি।"

মেয়েটি ফিরে এসে খবর দিলে, প্রিয়াঙ্গী তার ডিউটি শেষ

ক'রে তাড়াতাড়ি আর একটা কাজ নিয়ে বেরিয়ে গেছে—আজ আর ফিরবে না।

আমি প্রায় চীৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করলাম—

"কোথায় গেছে?"

মেয়েটি বললে, গারুট।

তীরবেগে গাড়ী ছোটালাম গারুটের পথে।

উএদার কাছে শুনলাম সে ক্যাম্পের সামনে ঠায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল আমাদের পথ চেয়ে। খানিক আগে হঠাৎ একটা মোটর বাইকের শব্দ শুনে সে রাস্তায় নেমে এসেছিল, ভেবেছিল হয়তো আমাদের কোনো খবর নিয়ে আসছে সংবাদবাহক। কোনো খবর এল না; বাইকে চ'ড়ে আসছিল ছোকরা একটি ইন্দোনেশীয় অফিসার, বান্দুং থেকে—ঝড়ের বেগে। উএদার দিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে সে চলে গেল গারুটের পথে।

গণশ্যাম

রোগা অনেক রকমের আছে—ঢ্যাঙা রোগা, রোগে ভুগে রোগা, অনাহারে রোগা, জরাজীর্ণ রোগা—শ্যাম সে ধরণের নয়। শ্যাম বেঁটে, সুস্থ, অন্নপুষ্ট, অপ্রাপ্তযৌবন, অথচ রোগা। রোগা, কালো এবং অতীব সাধারণ।

কিন্তু শ্যাম বাঙালী, এবং জীবনে তার পদার্পণ যে যুগে তাকে বাঙালীরা সংক্ষেপে বলে রবীন্দ্র যুগ, অর্থাৎ অসাধারণের যুগ।

তদুপরি তার জন্ম চৌধুরী বংশে। ও-বংশে মেয়েরাও অসাধারণ, ছেলেরা তো বটেই। কেউ লেখাপড়ায়, কেউ ব্যবসায়, কেউ ওকালতিতে, কেউ রাজনীতিতে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সঙ্গীতে, কেউ খেলায়, কেউ সেবায় গোটা বংশটাই দিক্‌পালে ছেয়ে গেছে। এই তথ্যটি গৃহশিক্ষক থেকে আরম্ভ ক'রে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবধি সবাই বার বার শ্যামকে শুনিয়েছেন। তাতে হাঁ না কোনো মন্তব্য না করলেও কথাটা শ্যামের কানে গেছে।

ইংরেজী ব্যাকরণে মারাত্মক ভুল হলে সহকারী প্রধানশিক্ষক কপালে ভুরু তুলে বলতেন, "উঁহু, তুমি শীতুর ভাই নয়কে।" অবশ্যই শ্যাম শীতুর সহোদর ভাই কিন্তু সে জবাব জোর গলায় দিতে গেলে শ্যামকে বোঝাতে হয় শীতু চৌধুরীর মত অসাধারণ নির্ভুল ইংরেজী লিখিয়ের ছোট ভাইয়ের কলম থেকে এরকম অসভ্য ভুল কী ক'রে বেরোতে পারে। গণিতের ঘণ্টায় শ্যামের খাতায় "সরল কর" শ্রেণীর অঙ্কগুলো ধাপে ধাপে জটপাকিয়ে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলে শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামের পিঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি চড় কষিয়ে নিজেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠতেন। "মেণ্ডেলের মুখ হাসালে এই ছেলে! কোন্ বেটা বলে নাতি ঠাকুর্দার মত হয়! যে বলে সে শ্যাম চৌধুরীকে চাক্ষুষ করেনি।"

এ লাঞ্ছনায় সাধারণ ছেলে হয় দেশত্যাগী হত, নয় পড়ার পাঠ

ঢুকিয়ে দিয়ে রকে গিয়ে আড্ডা গাড়ত। কিন্তু শ্যাম নিবাতকম্প প্রদীপের মত স্থিরচিত্তে তার দৈনন্দিন কর্তব্য ক'রে যেত।

শ্যামের মেজদিদি তাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন "হ্যাঁরে, তুই পড়া পারিস্‌নে কেন রে? পড়তে তোর ভালো লাগে না?"

গম্ভীর মুখে শ্যাম জবাব দিত, "ভালো লাগ্‌বে না কেন?"

"তবে?"

"আমি যা পড়তে চাই তা তো কেউ পড়ায় না।"

"তুই কী পড়তে চাস্‌?"

এ প্রশ্নের জবাবে শ্যাম চুপ ক'রে যেত। সে জান্‌ত, যে-কথাগুলো সহজেই বলা যায় সেগুলো মনের কথা নয়, সেগুলো ফাঁকি। আর মনের কথা খুলে বলবার আগে গভীরভাবে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। মেজদি পাত্র হিসেবে নেহাৎ খারাপ নয়, ওকে বলা যায়, কিন্তু যথাকালে, এখনো নয়।

একদিন শ্যাম হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। গভীর রাত্রে শ্যামের ঘরে আলো দেখে মেজদি উঁকি মেরে দেখলেন শ্যাম নিবিষ্ট চিত্তে পড়ছে। খুশী হয়ে তার ঘরে গিয়ে তাকে উৎসাহ দেবার জন্য দুটো কথা তাকে বলতে গিয়ে মেজদি দেখলেন শ্যাম পড়ছে দুটী মোটা বই। তার একটি ইংরেজী-বাঙলা অভিধান, অন্যটি কী তা বোঝা গেল না, তবে সেটী পাঠ্যপুস্তক নয়। বইটির ভাষা কঠিন, কারণ পড়াটা এগোচ্ছে অতি ধীরে। অভিধান ঘন ঘন দেখতে হচ্ছে।

নিঃশব্দে শ্যামের পিছনে গিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে মেজদি দেখলেন বইখানি হচ্ছে লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদ"—ইংরেজী সংস্করণ।

মেজদি সমস্যায় পড়লেন।

তিনি গুরুজন ব্যক্তি, অতএব শ্যামকে তাঁর শাসন করা উচিত—এত রাত্রে পড়াশুনো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোরতর ক্ষতিকর, বিশেষ বিষয়টা যখন পাঠ্যপুস্তক নয়। তিনি ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্রী, শিক্ষাব্রতী, অতএব তাঁর শ্যামকে বলা উচিত—একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাস

না করলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলা যায় না। কিন্তু এর কোনোটাই তাঁর করা হলো না।

কারণ মেজদি পুরানো পাপী। বিপ্লবের স্বপ্ন, বিপ্লবী-দলের সঙ্গে পরিচয় তাঁর বহুদিনের।

তিনি শুধু বললেন, চাপা গলায়,

"শ্যামবাবু।"

শ্যাম চমকে উঠে পিছন ফিরে চাইল। ভয়ে তার দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল—একটি মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই তার দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল।

মেজদি বললেন, "বড্ড শক্ত, নয়রে হাবা ছেলে?"

শ্যাম বললে, "হ্যাঁ।"

"অত শক্ত বই ধরলি কেন? কত তো সহজ বই রয়েছে।"

মেজদির অবিরাম প্রশ্ন এবং শ্যামের সংক্ষিপ্ত উত্তরমালা থেকে যে-ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা গেল তা এই : কয়েকমাস আগে একজন বিপ্লবী বড়দা দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে মেজদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দেখাটা হয়েছিল সদর বা অন্দর বৈঠকখানায় নয়—একটু আড়ালে, শ্যামেরই ঘরে। শ্যাম সেখানে উপস্থিত ছিল। তাকে সরাবার বিধিমত চেষ্টা করা হয়েছিল, সফল হয়নি। শ্যাম বুঝেছিল, গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনা ওখানে হবে। হয়তো কোনো ভবিষ্যতের মহাত্মার আত্মজীবনীতে ওই আলোচনার উল্লেখ থাকবে। ভারতের, জগতের ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়তো হবে ওইখানেই, তার নিজের ঘরেই—আর সে থাকবে অনুপস্থিত! কখনো নয়।

যে-আলোচনাটা হল সেটা শ্যাম বুঝল না একথা শ্যামের সামনে বলা হলে সে দৃঢ়স্বরে তার প্রতিবাদ করত। বড়দার বক্তব্যের অনেকখানিই বলা হয়েছিল দুর্বোধ্য ইংরেজীতে—সে কথা সত্যি। হয়তো তিনি ইচ্ছে ক'রেই ইংরেজী বলেছিলেন—যাতে তাঁদের

আলোচনার বিষয়টা শ্যাম বুঝতে না পারে। কিংবা হয়তো বহুকাল বাংলা দৈনিক না পড়তে পেয়ে ও-ইংরেজী কথাগুলোর বাংলা প্রতি-শব্দগুলো তিনি তখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। সে যাই হোক, মেজদির জবাবগুলো হচ্ছিল খাঁটি বাংলায়, যার মানে কাকদ্বীপ থেকে জলপাইগুড়ি, সিলেট থেকে মানভূম, কৃত্তিবাস থেকে সুধীন্দ্র দত্ত পর্যন্ত সবারই বোধগম্য।

বড়দা বলছিলেন অ্যাজিটেশন প্রপাগ্যাণ্ডার কথা; মেজদি বলছিলেন সারা দেশটাকে নাড়া দেবার, জাগিয়ে তোলবার কথা। বড়দা বলছিলেন শ্রেণীগত দাবীর ভিত্তিতে সমস্ত দেশময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক। মেজদি বলছিলেন, মুটে-মজুর, হাড়ী-মেথর সবার মধ্যে কাজ শুরু ক'রে দিতে হবে। মেজদি বলছিলেন, ভদ্রলোকদের আন্দোলনটা অতিমাত্রায় ভদ্র হয়ে উঠছে; ''ছোটলোক''দের পৌরুষের খানিকটা জোগান না পেলে আর তার মেরুদণ্ডটা খাড়া করা যাবে না। বড়দা বললেন, সংঘবদ্ধ প্রোলেতা-রিয়াতের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলন এমন বলশালী হয়ে উঠবে যে নেহাৎ মডারেটও আর প্রকাশ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী তুলতে সাহস পাবে না।

''প্রোলেতারিয়াত'' শব্দটা শোনবামাত্র সেটা বিদ্যুদ্‌গতিতে শ্যামের মজ্জায় ঢুকে গেল। তার মনে হল বড়দার এ কথাটা খুব ঠিক। ডোমিনিয়ন স্টেটাস্, প্রভিন্সিয়াল অটনমি প্রভৃতি বিজাতীয় ঝুটা মালগুলোর উপর বড়লোকদের পক্ষপাতিত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে: সহজ কথা 'স্বাধীনতা' আর তাদের মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। ওদের ওপর শ্যামের আর একটুও বিশ্বাস নেই। বড় বড় বিপ্লবী নেতারাও সব জেলে। আন্দোলন দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে।

অথচ লোকের ইচ্ছে তো মরেনি! এই সেদিন রাত্রে একজন ভিখিরী গাইছিল ক্ষুদিরামের গান, গাইছিল 'হে ভগবান্ রেখো হে মান, ভারত যেন স্বাধীন হয়।' টপ্ টপ্ ক'রে পয়সা এসে পড়ছিল পথের উপর, জানলায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুছছিল। শ্যাম নিজের চক্ষে দেখেছে। তবু হয় না কেন বিপ্লব?

মেজদি-বড়দার আলোচনায় জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এসব বড়লোকের নেতাগিরিতে আর চলবে না! চাই নতুন নেতৃত্ব, ভারতের মান রাখবে তারাই, এরা নয়। চাই সংঘবদ্ধ প্রোলেতারিয়াতের নেতৃত্ব।

কিন্তু প্রশ্ন, "প্রোলেতারিয়াত" কী? কোনো বিদেশী দল—শিন্ ফেনের মতো? নিশ্চয়ই নয়। বড়দা-মেজদির মত দেশাভিমানী ছেলে কক্ষনো দেশ স্বাধীন করবার জন্য বাইরে থেকে লোক ডেকে আনবে না। তবে কি "প্রোলেতারিয়াত" অনুশীলন-যুগান্তরের মত কোন নতুন বিপ্লবী দল? হতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও তথ্য আহরণ করা দরকার।

মেজদিকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। যে সাবধানী মেয়ে, হয়তো শ্যাম এসব কথা বুঝতে পারে জানলে তাকে আর কখনো এরকম আলোচনার সময় কাছে থাকতে দেবে না। না, এর খবর অন্য জায়গা থেকে নিতে হবে।

দৈবাৎ অনুসন্ধানের একটি পথ খুলে গেল। শ্যামের ঘরে রবীন্দ্রনাথের একখানি বড় ছবি টাঙানো ছিল। একদিন দম্কা হাওয়ায় সেখানি হঠাৎ দেওয়াল থেকে খসে গিয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। ছবিখানা আবার টাঙাতে গিয়ে শ্যামের চোখে পড়ল একটি কাগজের মোড়ক, সযত্নে ছবির পিছনে পিন দিয়ে গাঁথা—সম্ভবতঃ কেউ লুকিয়ে রেখেছে।

মোড়কখানা খুলে শ্যাম দেখল সেটি একটি বাংলা সাপ্তাহিক, নাম 'সর্বহারা'। নামটা শুনে মনে হয় কবিতার বই, কিন্তু পাতাগুলো ঘেঁটে মিলল মোটে একখানা কবিতা—তাতেও চোখের জল এক ফোঁটা নেই, আছে বিপ্লবের উন্মাদনা। শ্যাম নিবিষ্ট চিত্তে কাগজটি পড়তে শুরু ক'রে দিল।

দুর্লঙ্ঘ্য ভাষা। বাজে বই হলে দু'লাইন পড়েই শ্যাম বই মুড়ে রাখত, কিন্তু যাতে বিপ্লবের গন্ধ আছে, এমন লেখার একটা হেস্ত নেস্ত না ক'রে তাকে ছাড়তে তার মন সর্‌ল না। শ্যাম বই কাম্‌ড়ে ধরে রইল।

হঠাৎ একটা প্রবন্ধের মাঝামাঝি পেঁৗছে একটা শব্দ চোখে

প'ড়ে শ্যামের পাঠ ঠিক সেইভাবে বন্ধ হয়ে গেল, দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে প্রথম কৈলাসদর্শনে মানসতীর্থযাত্রীর চলা যেমন বন্ধ হয়। শব্দটি "প্রোলেতারিয়াত"।

কথাটার মানে কোথাও বোঝানো নেই। কিন্তু জিনিসটা যে বিরাট শক্তির একটা আধার তার ইঙ্গিত প্রবন্ধটিতে সুস্পষ্ট। আরো বোঝা গেল ওটা কোনো গোপন দল নয়, কারণ যে-কাগজটিতে কথাটার উল্লেখ, দেখা গেল তার সম্পাদকের নামধাম দেওয়া আছে। হয়তো সবাই জানে প্রোলেতারিয়াত কে বা কারা, একা শ্যামই জানে না, জগতের খবর রাখে না ব'লে। নিজের অজ্ঞতায় শ্যামের এই প্রথম লজ্জা হল।

সেই দিনই ইস্কুল পালিয়ে শ্যাম গিয়ে হাজির হল কাগজের সম্পাদকের দপ্তরে।

হাতীবাগানে একটা বস্তির মধ্যে টিনের একখানা ঘরে সম্পাদকের দপ্তর এবং শয়নকক্ষ। সম্পাদক রোগা, কালো এবং অত্যন্ত সাধারণ দর্শন। তাঁকে দেখে শ্যাম আশ্বস্ত হল। কাগজের ভাষা যেমন জটিল ইনি তেমন নন। শ্যামকে দেখে তিনি বললেন, "আসুন. বসুন।"

শ্যাম "আপনি" সম্বোধনে অভ্যস্থ নয়—"খোকা", "খোকাবাবু", "ওহে ছোকরা" প্রভৃতি ডাকই সে আজ পর্যন্ত শুনে এসেছে। হঠাৎ এরকম শিষ্ট আহ্বানে সে একটু অপ্রস্তুত হলেও মনে মনে খুশীই হল। গম্ভীরভাবে সে বলল,

"'সর্বহারা'র সাত থেকে আঠারো সংখ্যা আমার দরকার। আর এক থেকে পাঁচও—যদি ফুরিয়ে গিয়ে না থাকে।"

সম্পাদক বললেন, "আঠারোর সংখ্যা? আঠারোর সংখ্যা বেরিয়েছে কি?" একখানি কাগজ সামনেই খোলা ছিল, তার উপর চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন "এই তো শেষ সংখ্যা—এগারোর। তার পরে তো আর বেরোয়নি।"

শ্যাম বললে, "কেন? ছয়ের সংখ্যা ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের। তারপর বারো হপ্তা চলে গেছে, আঠারোর সংখ্যা তো বেরিয়ে যাওয়া উচিত।"

সম্পাদক হেসে বললেন, “উচিত বই কি! বুর্জোয়াশ্রেণীর কত কাগজ, প্রোলেতারিয়াত শ্রেণীর একটিমাত্র সাপ্তাহিক বাংলা-ভাষায়, প্রতি সপ্তাহে তা বেরোনো উচিত বই কি। কিন্তু বেরোয় কই? অর্থাভাব, পুলিসের চোখরাঙানি, আমার শারীরিক অসুস্থতা, এইসব নানান্ ঝামেলা পুইয়ে কাগজ চালাতে হয়, তাই অনিয়ম হয়ে যায়।”

শ্যাম অবাক হয়ে গেল। প্রোলেতারিয়াত শ্রেণীর একমাত্র বাংলা সাপ্তাহিক! বিপুল শক্তিমান প্রোলেতারিয়াত, যার সংঘবদ্ধ বৈপ্লবিক নেতৃত্বে ভারত স্বাধীন হবে, তার একখানা চারপাতার কাগজ নিয়মিত চালাবার ক্ষমতা নেই? কিন্তু সে-কথা তোলবার আগে প্রোলেতারিয়াত শব্দটার তাৎপর্য বোঝা আবশ্যক। এবং সে তত্ত্ব আহরণের সময় মূল্যবান্ এই মুহূর্ত।

সাবধানে শ্যাম প্রশ্ন করল, “আচ্ছা দেখুন, এই প্রোলেতারিয়াত নেতৃত্বের কথাটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?”

সম্পাদক বললেন, “আলবৎ দেব। কিন্তু তার আগে আমাকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবেন? বড়ই কাবু ক'রে দিয়েছে জ্বর, পরশু রাত থেকে ধরেছে, এখনো ছাড়েনি।”

শ্যাম জল দিতে দিতে বলল, “আপনি ডাক্তার ডাকুন।”

সম্পাদক উচ্চহাসি চাপতে গিয়ে বেদম কাশতে শুরু করলেন। শ্যামের জ্যাঠামশাইয়ের দুর্দান্ত হাঁপানী ছিল, অতএব কাশির রোগীর সেবার প্রক্রিয়া তার জানা ছিল। সে সম্পাদককে শুইয়ে তার বুক পিঠ মালিশ ক'রে দিতে লাগল। সম্পাদক সামলে উঠে বললেন, “সাবাস ভাই! যাক, আর দরকার নেই, বেশী তোয়াজ করলে আবার রোগ খাতের জমা হয়ে বসবে। আমাদের কি অসুখ পোষায়? এত কাজ, এই ক'টি লোক, তার ওপর যদি আবার একজন শুয়ে পড়ে তাহলেই তো চিত্তির।”

প্রোলেতারিয়াত নেতৃত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সম্পাদক আরও বহু বিষয়ের অবতারণা করলেন যার কিছুই শ্যাম জানে না। বড়দা যে সব খটমট কথা ব্যবহার করেছিলেন সম্পাদকও

তার অনেকগুলোর পুনরুল্লেখ করলেন। শ্যাম বুঝল ব্যাপার গভীর, তলিয়ে না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না।

সম্পাদক বললেন, "সব জিনিসই ওঠে পড়ে। কিন্তু যে-জিনিস ওঠার চেয়ে পড়েই বেশী, ওঠবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও—বুঝতে হবে তাতে ঘুণ ধরেছে! তার ধ্বসে পড়া কেউ রুখতে পারবে না। যেমন সাম্রাজ্যবাদ। আর যে-জিনিস প'ড়ে প'ড়েও তার দ্বিগুণ-বেগে চাগিয়ে ওঠে, মান্‌তে হবে ভবিষ্যৎ তারই হাতে। প্রোলে-তারিয়াতের সংখ্যা বাড়ছে, সঙ্ঘশক্তি বাড়ছে, জ্ঞান বাড়ছে, প্রভাব বাড়ছে। তাদের চেতনা চাষীদেরও জাগিয়ে তুলছে। তাদের আশা হতাশ পেতিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রোলেতারিয়াতের বিস্তার। বর্ণভেদ, দেশভেদ, ভাষাভেদ, জাতিভেদ অতিক্রম ক'রে তার ঐক্য। তারই হাতে মানুষজাতির ভবিতব্য।"

শ্যাম মন দিয়ে শুন্‌ল—বুঝল না প্রায় কিছুই। শুধু তার মনে হল মেজদি-বড়দা দুজনেরই কথার ভাব এ লোকটির বক্তৃতায় আছে—মেজদির মত সহজ, অথচ বড়দার মত ভারী ওজনের। বড়দার কথাগুলো যেন কেমন পড়ার বইএর মত শুকনো, এঁর কথায় রসকষ আছে। শ্যামের ভারী ভালো লাগল লোকটিকে।

সম্পাদক বললেন, "আপনি কাগজগুলো চেয়েছিলেন। নিন আমার নিজের ফাইলখানাই। আমি আর একখানা তৈরী ক'রে নেব। দাম দশদুগুণে কুড়ি, একটাকা চার আনা, পাঁচ সিকে। আর দেখুন, একটা কথা। ঘন ঘন আসবেন না এখানে, খামকা পেছনে পুলিস লাগবে। ওই তোরঙ্গটা খুলে দেখুন, খানকয়েক ভালো ভালো বই আছে। বাছাই ক'রে একখানা নিয়ে যান। ভালো ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে বুঝে পড়বেন। দাম দিতে হবে না। তবে, হারাবেন না দয়া ক'রে, পড়ে ফেরৎ দেবেন।"

শ্যাম বেছে নিলে লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদ"। তার কারণ সে বাঙালী, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হচ্ছে তার জীবনের মূলমন্ত্র। সেই সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরেছে, সম্পাদকের কাছ থেকে এই সংবাদটা পেয়ে তার বিশেষ কৌতূহল হল জানতে ঘুণটা ধরেছে কোথায়।

জ্যাঠামশায়ের ঘরে শ্যামের ডাক পড়ল।

আরাম কেদারায় শুয়ে জ্যাঠামশায়। মুখে আলবোলার নল হাতে একখানা কাগজ। শ্যাম বুঝলে ঐ কাগজখানার দরুণই তার তলব হয়েছে। জ্যাঠামশায় জিজ্ঞেস করলেন,

"দেখেছ মার্কশীটখানা?"

শ্যাম ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ।"

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে জ্যাঠামহাশয় বললেন,

"হ্যাঁ! লজ্জা হচ্ছে না তোর বলতে? তোর বাপের বংশে এ মার্কশীট কেউ দেখেছে? আর তুই আমার সামনে দাঁত বার ক'রে বলছিস্ 'হ্যাঁ'?"

শ্যাম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে! বল্ তোর মৎলবখানা কী! কুলীগিরি ক'রে খাবি? তাই বা তোকে কে দেবে—ঐ তো চেহারা! এই নম্বর দেখিয়ে তুই কলেজে পাবি জায়গা? কস্মিন্ কালেও নয়! কী ক'রে পাবি? তোর বাপ-ঠাকুদ্দার নাম ভাঙিয়ে? সে কথা মনেও স্থান দিস্ নি।"

"আজ্ঞে না।"

"ফের্! ফের কথা কইছিস্ আমার মুখের ওপর! বেহায়া ছেলে, বল্, কলেজে তোকে নেবে?"

শ্যাম বললে, সে কলেজে ভরতি হয়েছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে জ্যাঠামশায় বললেন, "অ্যাঁ? ভরতি হয়েছিস্? এই মার্কশীট দেখিয়ে? কী ক'রে?"

চৌধুরীদের কলেজ প্রেসিডেন্সী। ও-বংশে কলেজে ভরতি হওয়া মানে ভালো নম্বর পেয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢোকা। শ্যাম তিনের দরজার নম্বর দেখিয়ে শুধু পৈতৃক পাট্টার জোরে প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থান পেয়েছে এ হতেই পারে না। বহু ধরাধরি ক'রে ওকে ঢোকাতে হবে, এবং সে ঘৃণ্য ধরাধরিটা তাঁকেই করতে হবে এই ভেবেই তিনি অত বিরক্ত হয়েছিলেন। সেই কাজ তাঁর

অজানতেই হয়ে গেছে? কী ক'রে হবে? অথচ শ্যামের মুখ দেখে তো মনে হয় না সে মিথ্যেকথা বলছে! তবে কি—

জ্যাঠামশায়ের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবে কি ছোকরা অন্য কোনো কলেজে গিয়ে ভরতি হয়েছে? যদি তাই হয় এখুনি তার নাম কাটাতে হবে! চোখ পাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

''কোথায় ভরতি হয়েছিস্ তুই?''

শ্যাম বললে, ''মণ্ডলস্ কলেজ।''

জ্যাঠামশায় হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলেন। মণ্ডলস্ কলেজ! ও নামের কোনো শিক্ষায়তনের কথা তো তিনি শোনেন-নি! কলকাতার সব কলেজের নামই তো তিনি জানেন, মফঃস্বলের কলেজের নামও তাঁর অজানা নয়। হুঙ্কার দিয়ে তিনি বললেন,

"কী কলেজ বললি! কোথায় সে চুলোর কলেজ?"

"মণ্ডলস্ কলেজ। বৌবাজারে।"

''মিথ্যে কথা। ও-নামের কোনো কলেজ বৌবাজারে নেই। কোথাও নেই ও-নামের কলেজ! আমাকে তুই কলেজ চেনাচ্ছিস্, তোর বাপকে পড়িয়েছি আমি। বল্ কোথায় ভর্তি হয়েছিস্?''

ক্রমে জানা গেল যে-কলেজে শ্যাম ভরতি হয়েছে তার পদবী-শুদ্ধ পুরো নাম হচ্ছে ''মণ্ডলস্ কলেজ অভ টাইপরাইটিং''। ওর নাম কলেজ, কেননা ওখানে শুধু ম্যাট্রিকপাস ছেলেদেরই নেওয়া হয়।

রাগে আত্মহারা হয়ে জ্যাঠামশায় ডাকলেন,

''মাধুরী!''

মেজদি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। জ্যাঠামশায় পাড়া ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন,

''শোনো তোমার আদরের ভায়ের কীর্তি। উনি 'কলেজে' ভরতি হয়েছেন! কলেজের নাম মণ্ডলস্ কলেজ! শেখানো হয় টাইপরাইটিং। বি.এ.-এম.এ. পাস ক'রে উনি বেকারের দল পুষ্ট করতে চান না, তাই স্থির করেছেন অর্থকরী এই বিদ্যা অর্জন করতে। ওকে ব'লে দাও ঐ বৌবাজারেরই ফুটপাথে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে নিতে। আস্পর্ধা দেখ ছোঁড়ার! ওর বাপ আমার

কাছে মুখ খুলতে সাহস করে না—এখনও! আর ও আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যে ও কলেজে পড়বে না, টাইপরাইটিং শিখে পয়সা রোজগার করবে! নিয়ে যাও ওকে আমার সামনে থেকে—এখ্খুনি! নইলে ওর হাড় গুঁড়ো ক'রে ফেলব।''

মেজদি শ্যামকে নিয়ে গেল নিরালায়, তেতলার ঘরে।

শ্যাম স্বীকার করলে, শুধু পয়সা রোজগার করবার জন্যেই সে টাইপরাইটিং শিখছে না—অন্য কারণ আছে। মেজদির সন্দেহ হল কারণটা রাজনীতিগত।

টাইপরাইটিং-জানা কর্মীর বড় অভাব।

বোমার যুগে বিপ্লবের প্রচার হত বেশীরভাগ মুখে মুখে। দলের বড়দারা মেজদাদের বোঝাতেন, মেজদারা ছোড়দাদের, এমনি ক্রমে বিপ্লবী প্রেরণা সারা দলে ছড়িয়ে পড়ত। কিছু পড়ারও পাট ছিল, কিন্তু তার বই ছাপার হরফেই পাওয়া যেত। দলের হুকুমও চালাচালি হত মুখে মুখে অথবা সঙ্কেতের দ্বারা। বিস্তারিত লেখালেখির চল বড় একটা ছিল না।

এ যুগের ব্যবস্থা অন্য রকম। হালের বিপ্লবীদের মধ্যে মৌখিক আলোচনা যে হয় না তা নয়, কিন্তু তারও মূলে থাকে দেশবিদেশের আর্থনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ—অনেক পড়া, অনেক লেখার ফল। তাছাড়া, ত্রিবাঙ্কুর থেকে কাশ্মীর, ডিব্রুগড় থেকে আহমেদাবাদ, নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে আছে দলের শাখা। তাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ মুখে মুখে কী ক'রে রাখা সম্ভব? বিশেষ পার্টি যেকালে বে-আইনী।

তাই আজকাল বিপ্লবী মহলে টাইপরাইটিং-জানা ছেলের সেই চাহিদা, যে-চাহিদা সেকালে ছিল বোমার ফরমুলা জানা লোকের।

মেজদি জিজ্ঞেস করলেন, ''কেউ কি তোকে বলেছে টাইপ-রাইটিং স্কুলে ঢুকে দেশ উদ্ধার করতে?''

শ্যাম বললে, "না, কেউ বলেনি, আমি নিজেই ঢুকেছি।"

মেজদি রাগ ক'রে বললেন, "বড় কাজ করেছেন ছেলে। ওঁরা সব হবেন সানইয়াৎ সেন, গারিবাল্‌দি, লেনিন—আর তুমি হবে তাঁদের টাইপিস্ট!"

টাইপিস্টের পদোন্নতি হল।

জগদ্দলে মজুরবস্তীতে একটা পাঠচক্র ছিল। প্রতি সপ্তাহে সেখানে আলোচনা হত, নানাবিষয়ে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম এমন কি ভূয়োদর্শনও বাদ যেত না।

বই ধরে পড়ানো কমই হত। প্রথমতঃ হাঙ্গামা ভাষার—মজুরেরা ইংরেজীও বোঝে না, সংস্কৃত-হিন্দীও বোঝে না। যে-ভাষায় ওরা কথা বলে সে ভাষায় কাব্যসাহিত্য থাকলেও পাঠ্যপুস্তক নেই। তাছাড়া, সারাদিন কলে খাটার পর একঘেয়ে পড়ায় জ্ঞানবৃদ্ধি বড় একটা হয় না, বরং ঝিমুনিই আসে।

তার চাইতে অনেক ভালো লাগত মজুরদের আজব দেশ রুশের গল্প—যেখানে মজুর, তাদেরই মত কলেখাটা মজুর, ছিল গোলাম, হয়েছে ফোরম্যান, অফিসার. ম্যানেজার, মন্ত্রী। রুশে যা-কিছু হয়েছে তার সবার মূলে হচ্ছে শিক্ষা। কার্ল মার্ক্‌সের লেখা পড়ে শিখেছেন লেনিন, লেনিনের লেখা পড়ে শিখেছে দুনিয়ার মজুর। সেই বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত এই পাঠচক্রে!

কলকাতা থেকে কমরেড যেত পাঠচক্রে পড়াতে, পুলিসের নজর এড়িয়ে, এপথ ওপথ ঘুরে। হাঙ্গামার কাজ। শাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা কমরেডরা মজুর বস্তীতে ঢুকলেই সন্দেহ হয়। গোয়েন্দা হাপ্‌-গোয়েন্দার তো অভাব নেই, লাগিয়ে দেয় পুলিসের কানে, লাগায় পুলিস তাড়া। নিত্যি নতুন ফন্দী ক'রে কমরেডদের আনতে হয়, লুকিয়ে ফেলতে হয়, এ বস্তী ও বস্তী ঘুরিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে হয়। নানান্‌ ফ্যাসাদ, গুরুদায়িত্ব।

সেদিন যে-ছেলেটির পাঠচক্রে যাওয়ার কথা তার হঠাৎ অন্তিম-সময়ে কম্প দিয়ে জ্বর হল। ছেলেটির নাম হর্ষ। শ্যাম এসেছিল তার কাছে একতাড়া টাইপ করা কাগজ পৌঁছে দিতে। হর্ষ ধুঁকতে ধুঁকতে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে,

"কী আর হবে ও-কাগজ দিয়ে? দেখছ তো অবস্থা?"

শ্যাম ঘাড় নাড়লে। হর্ষ বললে,

"কিন্তু কী হবে? আজ যে একজন নতুন কন্‌ট্যাক্ট আসবে সুতোকল থেকে! খুব জঙ্গী মজুর। আজ না গেলেই নয়—শ্যাম!"

হর্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ে শ্যাম বললে, "কী?"

"তুমি যাবে?"

"কোথায়?"

"জগদ্দলের পাঠচক্রে। তুমি যাবে আমার হয়ে?"

শ্যাম জিজ্ঞেস করলে, "আমি গেলে কি হবে?"

হর্ষ বললে, "খুব হবে। কেউ না গেলে ওদের মুখ ছোট হয়ে যাবে নতুন কন্‌ট্যাক্টের সামনে। তুমি গিয়ে আর কিছু যদি নাই হয় ওদের বসাতে পারবে তো? তাতেই হবে।"

শ্যাম হিসেব ক'রে দেখল তখুনি জগদ্দল রওনা হলেও বাড়ী ফিরতে তার রাত বারোটা হবে। জ্যাঠামশায় হয়তো পুলিসে খবর দিয়ে একটা অনর্থ বাধাবেন। মেজদিকে একটা খবর পাঠাতে পারলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হত, কিন্তু সে উপায় নেই। বাড়ী ফিরে খবর দিতে গেলে জগদ্দলের গাড়ী ফসকে যাবে; টেলিফোন করতে গেলেও ধরবেন জ্যাঠামশায় স্বয়ং! নাঃ, কোনো বাঁচোয়া নেই।

হর্ষের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিয়ে শ্যাম বেরিয়ে পড়ল।

জগদ্দলে গান্ধী ময়দানের এক কোণে অন্ধকারে কে যেন নিঃশব্দে বিড়ি ফুঁকছে। শ্যাম তার কাছে গিয়ে দেশলাই চাইল।

ধূমপায়ী বললে, "দেশলাই নেই, বিঁড়ি থেকে ধরিয়ে নাও, কোথা থেকে আসছ?"

শ্যাম বললে, "এঃ, আমার বিড়িটা ভিজে গেছে, হর্ষ কমরেডের অসুখ করেছে, আমাকে পাঠিয়েছে।"

ধূমপায়ী বললে, "পেছু পেছু এস—একটু তফাতে।"

অন্ধকূপের মত খোলার ঘরের সারি। তারই মধ্য দিয়ে শ্যাম চলল বিড়ির আগুন অনুসরণ ক'রে। পথে কাদা, থেকে থেকে আবর্জনার স্তূপ, মাঝে মাঝে ছোটবড় ডোবা। এ রকম পথে শ্যাম জীবনে কখনো পা দেয়নি, কিন্তু সে একজন "পেশাদার বিপ্লবী"—লেনিনের লেখায় আছে, সখের বিপ্লবী দিয়ে বিপ্লব হয় না, চাই এমন মানুষ বিপ্লবই যাদের পেশা—তার তো পা হড়কালে চলবে না।

বিড়ির আগুন একখানা খোলার ঘরের সামনে এসে থামল। ঘরখানার দরজার মাথা শ্যামের কাঁধ অবধি পৌঁছয় না, একেবারে কুর্নিশ করবার মত নুয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। ঘুঁটে আর কেরোসিনের ডিবের ধোঁয়ায় ঘরখানি এত অন্ধকার যে শ্যাম প্রথম পদক্ষেপে বুঝতে পারেনি ঘরের মেঝেটা রাস্তা থেকে পাক্কা আধ হাত নিচু। হোঁচট খেতে খেতে সে সামলে নিলে।

ঘরে বসে হিন্দুস্থানী একটি মেয়ে, রান্নায় ব্যস্ত। গুটি দুই তিন ছেলেমেয়েও ঘরে আছে, একটি কাঁদছে, একটি তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে আর একটি তারস্বরে 'অ আ' মুখস্থ পড়ছে। আগন্তুক দুটিকে দেখে মেয়েটি একহাতে মাথার ঘোমটা টেনে আর এক হাত দিয়ে কী একটা ইশারা করল। শ্যাম তার তাৎপর্য বুঝলে না, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কালবিলম্ব না ক'রে শ্যামের হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। মৃদুস্বরে সে বললে, "উ বস্তীতে যেতে হবে, এখানে আজ গোলমাল।"

'গোলমালের' খবর পাঠচক্রের সমস্ত সভ্যের কাছে পৌঁছে দিতে হল, নতুন কন্‌ট্যাক্ট সুতোকলের জঙ্গীমজুরকেও—যাতে সবাই 'উ বস্তী'তে যায়। শ্যামও পিছু পিছু গেল। উ বস্তীতে পৌঁছতে রাত আটটা হয়ে গেল। সেখানে যার ঘরে পাঠচক্র বসবে তার কাছে বোধ হয় তখনও এত্তেলা এসে পৌঁছয়নি, সে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ডাক

শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে ব্যাপারটা শুনে সে বেরিয়ে গেল তেলভর্তি একখানা লণ্ঠন জোগাড়ের চেষ্টায়। অন্ধকারে শ্যাম এবং তার সহচর একখানা খাটিয়ার উপর বসে পড়ল।

লোকটি বললে, "এখানে তোমার নাম হবে মুজীব, বুঝলে?"

শ্যাম বললে, "বেশ।"

লোকটি হেসে বললে, "এক একজন নতুন কমরেড আসে, তারা মুসলমান নাম নিতে চায় না। মজুরদের মধ্যেও আছে অমন লোক। নাগপুর হরতালের সময় একজন মহারাষ্ট্রী মজুরকে আমরা এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এটা মুসলমান বস্তী; এখানে যদি কেউ তাকে 'পান্ডুরং' ব'লে ডাকে তবে পাঁচ মিনিটে সে গেরেফতার হয়ে যাবে। তাই আমরা তার কোমরে রঙীন লুঙ্গি জড়ালাম, চোখে সুরমা দিলাম, পাঠ পড়িয়ে নাম দিলাম 'হমীদ'; কিন্তু লোকটা কেমন শিঁটিয়ে রইল, কিছুতেই ভোলটা ঠিক নিতে চাইলে না। যেমন চারপাশটা সেই রকম হতে হবে, নইলে চট্ ক'রে ধরা পড়ে যাবে, এইটুকুই তো কথা! ভোল বদলালেই ভেতরটা তো আর বদলে যাচ্ছে না।"

শ্যাম বললে, "না।"

লোকটি বললে, "তুমিও এক কাজ কর, চট ক'রে এই অন্ধকারে কাপড়টা বদলে নাও। আমার ঘর এই বস্তীতেই, এখুনি তোমাকে অন্য কাপড় এনে দিচ্ছি। তোমার কাপড়চোপড় পুঁটলি বেঁধে রাখ, যাবার পথে কোথাও আবার বদলে নিও। কী বলো?"

শ্যাম বললে, "বেশ।"

সম্পূর্ণ প্রোলেতারীয় পরিবেশে, নিষ্কলুষ প্রোলেতারীয় পরিচ্ছদে দেহ আবৃত ক'রে শ্যাম পাঠচক্রে বসল।

প্রথম দর্শনেই জঙ্গীমজুর বিসম্ভরের শ্যামকে ভালো লেগে গেল। সে বললে,

"এই ব্যক্তি বাইরের কমরেড? বলো কি? এ তো বিলকুল মজুরের মত দেখতে। আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে তো আমার মালুমই হত না এ জগদ্দলের মজুর নয়।"

শ্যামের পথপ্রদর্শক ইয়াসিন সগর্বে বললে,

"আরে, বলিনি তোমাকে? আমার পার্টি আর দশটা পার্টির মতো নয়, মুখে সোশ্যালিজম্ কাজে বুরজোয়া। আমাদের পার্টি প্রোলেতারিয়াতের, আসল চীজ।"

বিসম্ভর একটু হুঁশিয়ার হয়ে বল্‌লে, "দেখা যাবে। আগে আমার কতগুলো কথার জবাব দাও।"

ইয়াসিন বললে "রোসো বাপু, আমাদের কাজ বা-কায়দা হয়ে থাকে। আগে আমাদের সভাপতি ঠিক করা হোক্, তারপর তার হুকুমমত কাজ-কারবার চলবে। আমি প্রস্তাব করছি সভাপতি হোক বংশীধর।"

বংশীধর চটকল মজুর, কম কথার মানুষ। মজলিসে মিছিলে তার সাধারণ দায়িত্ব হচ্ছে শান্তিরক্ষার; কালো পাথরের মূর্তির মত বিরাট দেহখানা তার শান্তিরক্ষার উপযোগীই বটে। পাঠচক্রে সভাপতির আসনখানা তার বরাবরের। সভায় কেউ কখনো তাকে কোনো প্রশ্ন তুলতে দেখেনি, তর্কাতর্কিতে যোগ দেওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেও তার কাছ থেকে কোনো মতামত আদায় করা যায় না। তবু যে কেন সে নিয়মিত পাঠচক্রে হাজিরা দিত সেকথার সদুত্তর কেউ দিতে পারেনি।

শ্যামের মনে হল, কোথায় যেন বংশীধরের সঙ্গে তার আদল আছে।

সভা আরম্ভ হল। বিসম্ভর অনেক কথা তুলল, তার বেশীর ভাগের জবাব দিতে শুরু করল শ্যাম, দিল ইয়াসিন। অন্য মজুরেরাও খানিক খানিক জবাব দিলে। শুধু একটি প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করল শ্যাম, কেননা সেটার উল্লেখ ছিল লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদে"। ঐ একখানি বই শ্যামের কণ্ঠস্থ ছিল। বিসম্ভর খুব মনোযোগ দিয়ে শ্যামের ব্যাখ্যাটা শুনল।

ঘণ্টা দুই ধরে আলোচনা চলল। কিছু কিছু বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেল, কিছুর হল না। যেগুলো হল না তার পরের বারে আবার সেগুলো তোলা হবে, শ্যাম প'ড়ে তৈরী হয়ে আসবে, এই সিদ্ধান্তের পর সভা ভঙ্গ হল।

বিসম্‌ভর বললে, "চলো কমরেড তোমাকে স্টেশনে পেঁাছে দিয়ে আসি।"

ইয়াসিন বললে, "আরে না, না, আমি পেঁাছে দেব।"

বংশীধর বললে, "আমার সঙ্গে এস।"

জেলখানার চেয়ে উঁচু চটকলের দেওয়াল। পাশ দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় সে-দেওয়ালের শেষ নেই। মাঝে মাঝে ল্যাম্পপোস্ট, তার তলা দিয়ে যাবার সময় শ্যামের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বুঝি অন্ধকারে লুকোনো গোয়েন্দারা তাকে দেখে ফেললে। আবার আসে অন্ধকার, প্রাণ পায় ভরসা—পরক্ষণেই দাঁত বার ক'রে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে আর একখানা ল্যাম্পপোস্ট। আবার আলোর নির্দয় অত্যাচার!

পিছনে চেয়ে দেখবার অদম্য ইচ্ছা শ্যামের, কিন্তু বংশীর বারণ। বংশী পিছনে আছে, বলেছে বিপদ দেখলে শ্যামকে হুঁশিয়ার ক'রে দেবে। তবু চোখ দুটো বশ মান্‌তে চায় না; জোর ক'রে তাদের সাম্‌নেমুখো ক'রে রাখতে হয়।

পথে লোক দেখলেই মনে হয় গোয়েন্দা। কোট-ধুতি-পরা ভদ্রলোক দেখলে তো শ্যাম একরকম ধরেই নেয় তারা গুপ্ত পুলিসের লোক, মজুরবেশী লোক দেখলেও মনে হয় ওটা ওদের ছদ্মবেশ। বরং জলজ্যান্ত উর্দিপরা পুলিস দেখলে প্রাণে আশ্বাস হয়।

অনেকটা পথ চলবার পর বংশী এগিয়ে এসে বললে, এবার রাস্তা সাফ। একটু আগেই মধ্যবিত্ত বাঙালীপাড়া, সেখান থেকে গাড়ী ধরলে শ্যামকে কেউ বড় একটা সন্দেহ করবে না। একটু সাবধানে থাকতে হবে অবশ্যই, কিন্তু অতি-সাবধানে আবার উল্টো ফল হতে পারে।

সে রাত্রে বাড়ী পেঁাছনোর পর জ্যাঠামশায়ের তর্জন, মেজদির বকুনি এবং আর কী হল না হল শ্যামের একটুও মনে নেই। শুধু

বিছানায় শুয়ে তার মনে হল, যা ঘটেছে তার সবটাই কল্পনা। রাত্রে তার ঘুম হল না।

সংস্কৃত শ্লোকে বলে, সুখ-দুঃখের   শ্যামের বই-এ বলে, ইতিহাসের ধারা বক্রপথ।   মল্লযুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কখনো কখনো জয়ী হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আসে প্রগতির পাল্টা জবাব।

বঙ্গভঙ্গের পরে এল স্বদেশী আন্দোলন। রোল্যাট অ্যাক্টের পরে হল অসহযোগ। '৩১ সালের জোয়ারের পর এল '৩৩ সালের ভাঁটা—জগৎজুড়ে। জার্মানিতে হিটলারী রাজ কায়েম হল, জাপান মাঞ্চুরিয়া ঘায়েল ক'রে খাস চীনের টুঁটি চেপে ধরবার জন্য হাত বাড়াল। মুসোলীনির বক্তৃতার সুর চড়তে আরম্ভ করল।

কিন্তু '৩৪ সালে ফাঁসের গেরো আবার ফস্‌কে গেল। ফ্রান্সের লোকসাধারণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়াল। স্পেনও গেল ঐ পথে—সারা ইউরোপে তার সাড়া পড়ে গেল।

দেশেও ধরপাকড়ের ঢেউ চরমে উঠে ঝিমিয়ে গেল। শ্যামের বই-এ লেখেঃ বিপ্লবের ঢেউ পুরোনো মাটিতে ধস্‌ ধরিয়ে তার উপর নতুন সমাজের পলিমাটি ফেলে। সে এক জিনিস। আর প্রতিক্রিয়া দেয় জ্যান্ত নদীর মুখে বালির বাঁধ। সে আরেক জিনিস—দুদিন না যেতেই স্রোতের তোড় তাতে ফাটল ধরায়।

'৩৩ সালে গোটা দেশটা ছিল জেলখানা। '৩৪ সাল থেকে তার দেওয়ালে ছোটবড় ফাটল দেখা দিতে লাগল। আজ বোম্বাই বন্দরে ধর্ম্মঘট, কাল যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলন, তার পরদিন কলকাতায় ধর্ম্মঘট—নিত্যি এমনি হাঙ্গামায় জেল জুজুর অষ্টবন্ধন ক্রমেই আল্‌গা হতে আরম্ভ করল। যেএলাকায় দুদিন আগে পাঁচজন জমা হলে বন্দুকধারী সেপাই তেড়ে আসত সেখানে বিনা হুকুমে হাজার লোকের জমায়েত হতে লাগল। যে সব বই ছিল অসূর্য্যম্পশ্যা, মলাট ঢাকা থাকত চার ফেরতা খবরের কাগজে, তারা

প্রথমে বেরোলো ফুটপাথে, তারপর দোকানে দোকানে এবং অবশেষে একেবারে বে-পরদা হয়ে লম্বাচুল বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘোরাফেরা করতে লাগল—প্রকাশ্য দিবালোকে। বে-আইনী রাজনীতিক দলগুলির আবরণও স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

যে-শ্যাম সন্ধ্যের অন্ধকারে বজবজ থেকে হাজিনগর, বাউড়িয়া থেকে ভদ্রেশ্বর ঘুরে ঘুরে কুল্লে পাঁচশো কপি ইস্তাহার ছড়াতে পারলে ধন্য হয়ে যেত, সেই শ্যাম দশ দশ হাজার ইস্তাহার বিলি করতে লাগল এক এক এলাকায়—'৩৬এর নির্বাচনের হিড়কে। আগে যে-কথা হাতে লেখা পত্রিকায় লিখে বার করতেও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত আজ সেই কথা বেরোচ্ছে ছাপার হরফে, পার্টির নামে, আর সে জিনিস ছড়াচ্ছে শ্যামনগর, জগদ্দল, বারাকপুরের বস্তীতে বস্তীতে, মিল গেটে, থানার চৌহদ্দীর চারপাশে।

এবং শুধু শ্যামই নয়। সেদিন আর নেই যখন হর্ষের অসুখ হলে পাঠচক্র বিপন্ন হয়ে পড়ে—শ্যামকে গিয়ে কার্যোদ্ধার ক'রে দিতে হয়। এখন পার্টির চারপাশে কাতারে কাতারে লোক—কত স্বনামধন্য বিপ্লবী, এক যুগ জেলে কাটিয়ে এসেছেন, কত শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, যাঁদের এক ডাকে হাজার মজুর দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসে জড়ো হয়, কত নিখিল ভারতের ছাত্র নেতা, কত দেশ-বিদেশে শিক্ষা পাওয়া কর্মী।

লোক বহু, কিন্তু কাজও অনেক। শ্যাম আগেও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেত না, এখনও পায় না। কত কাজ! গজ গজ শালু, বস্তা বস্তা তুলো আনতে হয়, ঝাণ্ডা তৈরী করতে হয়। কাগজ কিনতে হয় রীম রীম, লাখ ইস্তাহার ছাপাতে হয়। সে ইস্তাহার বিলি করাও এক ব্যাপার। বড় বড় সভা হয়, তার মাইকের বন্দোবস্ত, অল্প টাকায় পাণ্ডাল তৈরী, এও আছে। আর সবচাইতে বড় কাজ, টাকার জোগাড় করা। আগে অল্প-সল্প যা লাগতো মেজদির কাছে হাত পেতে পাওয়া যেত। এখন রসীদ বই কেটে হপ্তার দিন মিল গেটে গেটে লোক লাগিয়ে দুশো পাঁচশো পয়সা আনা সিকি আধুলি জড়ো করতে হয়। তার হিসেব রাখা, সেও

প্রায় নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপা! মন্ডল্‌স্‌ কলেজে হিসেব রাখা শেখানো হত, কী ভেবে শ্যাম ওটা শিখে নিয়েছিল, এখন তা প্রতি হাত কাজে লেগে যাচ্ছে। পার্টিতে লোক অনেক, কিন্তু হিসেব রাখতে জানে এমন লোক মুষ্টিমেয়।

মেজদির তবু রাগ পড়ে না। বলে,

"হ্যাঁ রে শ্যাম, কত লোকের নাম বেরোচ্ছে কাগজে, কই তোর নাম তো দেখতে পাইনে। অথচ তুই তো দেখি সারাদিন গাধার মত খেটে বেড়াস্‌!"

শ্যাম জিভ্‌ কেটে বলে, "ওরেব্বাবা, আমার নাম কাগজে বেরোলে কি জ্যাঠামশায় আমাকে আস্ত রাখবে?"

ইউরোপে যুদ্ধ বাধল।

যাদের নাম খবরের কাগজে বেরোতো তারা কেউ ডুবো-জাহাজের মত হঠাৎ তলিয়ে গেল, কেউ যন্ডভবিষ্যের মত গ্রেপ্তার হল। সভাসমিতি-আদি আইনসংগত কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ হল না বটে, কিন্তু সবাই বুঝলে, চাকা আবার ঘুরল।

নব বাস পরিত্যাগ ক'রে শ্যাম আবার তার জীর্ণ বাস পরিগ্রহ করল। আবার সেই জগদ্দলের পাঠচক্র, আবার সেই সাইক্লোস্টাইলে ছাপা 'স্ফুলিঙ্গ', 'চিঙারে', 'ইনকলাব' বিলির বন্দোবস্ত। কিন্তু শ্যামের মনে হল আর শুধু ওতেই হবে না, অন্য কিছুও চাই। এবারে যেন বিপ্লবটা আরো এগিয়ে এসেছে। নরওয়ে গেল, হল্যান্ড গেল, বেলজিয়ম আবার জর্মন দখলে এল। ফ্রান্সের বিরাট মাজিনো দেওয়াল—অক্ষয় কবচ, তাও প্রায় ফুঁয়ে উড়ে গেল। শ্যাম ভাবল, এত প্রচন্ড একটা শক্তিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঠেকাতে পারবে না। একে হারাতে হলে চাই একটা প্রকান্ড বিপ্লবী শক্তির পাল্টা আক্রমণ। ভারতবর্ষের মত একটা সুপ্ত সিংহকে যদি জাগানো যায়—খুব তাড়াতাড়ি—তবে ফাশিবাদকে একবার একহাত দেখে নেওয়া যায়।

হর্ষ বললে, আর চীনকেও। চীনে তো বিপ্লবের জমি

তৈরীই আছে। মাও সে তুং, জু দে, এরা শুধু ইস্তাহার নয়, হাতিয়ার হাতে যুদ্ধ করছে। চীনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে।

হর্ষের কথাটা শ্যামের খুবই মনে ধরল। কিন্তু চীন যাওয়া যায় কী প্রকারে?

পুলিসের দৃষ্টি ক্রমেই প্রখর হতে আরম্ভ করল। শ্যামেদের কাজও সেই আন্দাজে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। আর একটা নতুন কাজও গজিয়ে উঠল—যারা ধরা পড়ছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। বাঘ শিকারের চাইতেও বিপজ্জনক কাজ! বাঘ শিকারে গুলি ফসকে গেলে শুধু শিকারীদের বিপদ, কিন্তু জেলের চিঠি-পত্রের একখানা ফসকে গেলে সারা পার্টির সংগঠন নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। বিপ্লব পিছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়!

আরও শক্ত কাজ ক্যাম্পে-আটক কমরেডদের সঙ্গে বই-চিঠি চালাচালি। কলকাতার ভীড়ে এক-আধ টুক্‌রো কাগজ এ-হাত ও-হাত করা আর হিজলী ক্যাম্পে দুখানা থান ইঁটের মত ভারী মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পেঁাছে দেওয়ায় আকাশ-পাতাল তফাৎ।

প্রথম বারে তো শ্যাম ভেবেই পায়নি, ক্যাম্পের কাজটা কী ক'রে ওৎরানো সম্ভব। হাতে খড়ি হল তার গদর দলের এক বুড়ো শিখের কাছে। বুড়ো বললে,

"যাও, একদিন শুধু হাতে জায়গাটা ঘুরে এস। চোখ-কান খুলে রেখ, দেখো ও-গাড়ীতে যারা যাতায়াত করে তারা কী ধরণের লোক, কলকাতায় কী জিনিসের সওদা করে, কী বলে, কীভাবে চলা-ফেরা করে। তারপর ওদেরই একজন হয়ে চলে যেও। শেষ কাজটুকু আমি সেরে দেব—ক্যাম্পের রক্ষীদলে খাস আমার গাঁয়ের লোক আছে।"

যেদিন সত্যি জিনিস নিয়ে ক্যাম্পে রওনা হতে হল, সেদিন হাওড়া স্টেশনে গাড়ী চড়া থেকে শ্যামের বুকে শুরু হল জয়ঢাকের গৎতোড়া। হাওড়ায় আবার ফিরে না আসা ইস্তক সে বাদ্দি বন্ধ হল না।

বড়বাজারে যে-লোকটি তার পিছু নিয়েছিল সে গাড়ীতে উঠে বসল ঠিক তার পাশে। সামনে বসল একটি লোক, নাদুস-নুদুস, জ্বলজ্বলে চোখ—অবিকল ঝানু গোয়েন্দা রাধানাথ পাড়ুইএর মত দেখতে; ও লোক পুলিশ না হয়ে যায় না। সময় হলে খপ ক'রে দুজনে দুদিক থেকে শ্যামকে চেপে ধরবে। একজন পাঁজরায় রীভলভার ঠেকাবে, অন্যজন হাতকড়া পরাবে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে শ্যামের ঘাড়ে হাত দিল। ব্যস্—এই-বারে তিনদিক থেকে! আর নিস্তার নেই!—কিন্তু তবু, ঘাবড়ালে চলবে না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবে চম্‌কে ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখলে পিছনে বুড়ো হর্‌মিন্দর সিং!

রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বুড়োটা পাগল না কি? না অথর্ব হয়ে পড়েছে? সামনে পাশে গোয়েন্দা, চুবড়ীতে বামাল, এই অবস্থায় সে শ্যামকে চিনে ফেললে! এই গদর দলের সুদীর্ঘ বৈপ্লবিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফল? এর চেয়ে তো বাঙলা দেশের শিশুও বেশী জানে।

হর্‌মিন্দর সিং বললে, "বাউজী, টাইম কী হ্যায়?"

শ্যাম বিরক্তমুখে বললে, "আমার কাছে ঘড়ি নেই, বাইরে স্টেশনের ঘড়ি দেখ না।"

হর্‌মিন্দর হেসে বললে, "চোখ ঠিক নেই, ঘড়ি দেখতে পারি না, বুড়ো মানুষ—"

পাশের লোকটি বললে, "বত্রিশ হয়েছে, এখনও তিন মিনিট দেরী গাড়ী ছাড়তে।"

হর্‌মিন্দর জিজ্ঞেস করলে, "খড়গ্‌পুর কখন পৌঁছবে?"

শ্যাম বললে, "নটা চুয়ান্নয়।"

"আচ্ছা?" ব'লে হর্‌মিন্দর আয়েস ক'রে পা মুড়ে বসল।

পাশের লোকটি শ্যামকে জিজ্ঞেস করলে, "কদ্দূর যাওয়া হবে?"

শ্যামের গলা শুকিয়ে গেল। পাঠ তার মুখস্থই ছিল। হর্‌মিন্দর সিংটা যদি ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে না দিত যে ত্যবও

গন্তব্যস্থল খড়গ্‌পুর তাহলে শ্যাম নির্ভয়ে বলত সে খড়গ্‌পুর যাচ্ছে। কিন্তু এখন কি তা বলা ঠিক হবে? একবার তার ইচ্ছে হল বলে সে যাবে চেঙাইল—চেঙাইলের পথ তো তার অজানা নয়—কিন্তু তাই বা বলে কি ক'রে? চেঙাইলে যে ধর্মঘট হচ্ছে চটকল মজুরদের। সে বললে, "আজ্ঞে খড়গ্‌পুর।"

হর্‌মিন্দর পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলে,

"আপ্‌ ভী খড়গ্‌পুর যা রহে হেঁ?"

শ্যাম বললে, হ্যাঁ।

আবার প্রশ্ন, "খড়গ্‌পুরে কোথায় যাবে বাউজী?"

মনে মনে শ্যাম বললে, চুলোয়! মুখে বললে,

"রেলওয়ে কলোনিতে।"

হর্‌মিন্দর বললে, "সে কোথায়? গুর্‌দোয়ারার কাছাকাছি কোথাও? আমি গুর্‌দোয়ারায় যাব। আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল এক সরদার, কিন্তু সে তো এল না। গাড়ী ভী ছেড়ে দিচ্ছে! বুড়ো মানুষ, পথঘাট ভালো দেখতে পাই না—"

শ্যাম বললে, "গুরদোয়ারা অন্য রাস্তায়। সাইক্ল রিকশাকে বললেই পেঁাছে দেবে। আমি ব'লে দেব'খন"

হর্‌মিন্দর বললে, "মেহেরবানী আপকী।"

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটি শিখ চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে উঠল। গাড়ীর লোকেরা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল—যারা এক সেকেণ্ড আগে নিজেরাই চলন্ত গাড়ীতে উঠেছে তারাও। হর্‌মিন্দর শণের মত শাদা ভুরু জোড়া কুঁচকে আগন্তুকের দিকে চাইল। আগন্তুক বললে,

"সৎশ্রী অকাল বাবাজী।"

হর্‌মিন্দর আশ্বস্ত হয়ে বললে, "সৎশ্রী অকাল, সরদারা। এত দেরী করলে? আমি এই এখুনি এই বাবুকে বলছিলাম, আমাকে একাই খড়গ্‌পুরের পথে পথে গুরদোয়ারা খুঁজে বেড়াতে হবে।"

সরদার বললে, "হেডকোয়ার্টারে দেরী হয়ে গেল।"

আর হর্‌মিন্দর শ্যামকে জ্বালালে না, নবাগতের সঙ্গে পাঞ্জাবে রোপড়ের আশপাশের নানা গ্রামীন সমস্যার আলোচনায় পথটুকু কাটিয়ে দিলে। কিন্তু তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শ্যামের

বিপত্তি কিছুমাত্র কমল না। উৎসুক সহযাত্রীদের অনর্গল জেরায় তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। খড়গপুরের রেলওয়ে কলোনির কোন্ বাড়িটিতে সে যাবে, গৃহস্বামী তার কী রকম মামা, শ্যামের কী কাজ, ছুটি কদিনের, এসব নানা বৃত্তান্ত তাকে অন্ততঃ দশবার ওগ্‌রাতে হল। পাড়ুই-প্রায় মশাইটি চেঙাইলে নেমে গেলেন, কিন্তু তাঁর জায়গা নিলেন যিনি তাঁর কৌতূহল অদম্য। তিনি গেলেন হাওড়ে নেমে, এলেন আর একটি।

পাশের লোকটি অনড় অচল হয়ে শ্যামের গা ঘেঁষে বসে রইল এবং দশবার মন দিয়ে তার শেখা বুলি শুনলে। শ্যামের দৃঢ় ধারণা হল লোকটি মিলিয়ে দেখছে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে বলা তার গল্পগুলো অভিন্ন কি না। গরমিল বেরোলেই বোধ হয় হাতকড়াও বেরিয়ে পড়বে।

খড়গপুর যতই এগিয়ে আসতে লাগল শ্যামের ভীতিও ততই বাড়তে লাগল। এইবার সব খড়গপুরের বাসিন্দেরা গাড়িতে উঠছে, এইবার স্থানীয় লোকেরা তার পড়ায় ভুল ধরবে। কোনো না কোনো ত্রুটি বেরিয়ে পড়বেই এবার। অতএব যখন সে বিনা বাধায় খড়গপুরে এসে নাম্‌ল, রিকশা ধরল, রিকশায় বসে হুকুম দিল "রেলওয়ে কলোনি চল" এবং পাশের সেই লোকটি তার হুকুম শুনে তখুনি তার পিছু না নিয়ে চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল, তখনও তার মনে হল—লোকটি থানায় খবর দিতে গেল।

পরদিন সন্ধ্যে বেলায় হর্‌মিন্দর ক্যাম্পে বন্দী কমরেডদের চিঠি এনে শ্যামের হাতে পৌঁছে দিল। বলল, "রাস্তায় তুমি ছোটোখাটো দু'একটা ভুল করেছ, কিন্তু সে কেউ ধরতে পারেনি। কলকাতায় দেখা ক'রো, সব বুঝিয়ে বলব।"

শ্যাম শুনল তার যেটুকু ভুল হয়েছে তা অভিনয়গত। কোনো একটা ভোল নিতে হলে সেটাকে ঠিক সেইভাবে তৈরী করতে হবে যেভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা নিজেদের পার্ট তৈরী করেন। মামুলী অভিনেতারা শুধু কথাগুলো মুখস্থ করে; শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা তাঁদের পার্টের চোখ, মুখ, চলার ধরণ, হাত নাড়া, উচ্চারণ সবকিছু এমন নিখুঁতভাবে তৈরী করেন যে মুহূর্তের মধ্যে দর্শক ভুলে যায়

সে অভিনয় দেখছে। শ্যামের ছদ্মরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে অভিনয়ের এই সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য তাকে আয়ত্ত করতে হবে।

রাতারাতি শ্যাম থীয়েটারভক্ত হয়ে উঠল।

প্রথম কেনা হল অভিনয়কৌশল সম্বন্ধে স্টানিস্লাভ্স্কির একখানা বই। তারপর সে বুঝল এ-বিদ্যা শুধু প'ড়ে আয়ত্ত করা যাবে না, এর প্রয়োগটাও দেখতে হবে। প্রয়োগ দেখবার একটা সুযোগও মিলে গেল।

শনিবার জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমা থীয়েটার যাবেন ঠিক হয়েছিল। টিকিট পর্যন্ত কেনা ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই হঠাৎ শেষ মুহূর্তে জরুরী কাজে বেরিয়ে গিয়ে সব পণ্ড ক'রে দিলেন। পালা "প্রফুল্ল"। শিশির ভাদুড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, আরও সব নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রী নামবেন, কলকাতা ভেঙে লোক আসবে, এই সময়ে পড়লো ওঁর কাজ—এই কথাটা জ্যাঠাইমা আর্ত-স্বরে সবাইকে জানাচ্ছিলেন। হঠাৎ শ্যাম উদ্যোগী হয়ে বললে, সে নিয়ে যাবে জ্যাঠাইমাকে।

জ্যাঠাইমা হাতে স্বর্গ পেলেন, কেন না এর আগে শত উপরোধ সত্ত্বেও শ্যামকে কখনো থীয়েটারে হাজির করা যায়নি। হঠাৎ এই বিষমসময়ে শ্যামের এমন অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। মেজদিও আশ্চর্য হলেন। দেশ স্বাধীন না ক'রে শ্যাম কখনও থীয়েটার দেখবে না এমনি একটা ধারণা মেজদির মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ধারণা ভেঙে যাওয়ায় তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন, জগতে শাশ্বত কিছুই নেই।

যুদ্ধে যোগ দেবার ইচ্ছা শ্যামের বরাবরের। বিপ্লব সম্বন্ধে তার ছেলেবেলাকার রোম্যান্টিক ধারণা আর নেই। জোর ক'রে বিপ্লব তৈরী করা যায় না, বোমা ছুঁড়ে সমাজের পুরোণো ভিত্ ভেঙে

নতুন ভিত্ গড়া যায় না; লোক না জাগলে, অবস্থা অনুকূল না হলে সমাজে বিপ্লব ঘটে না, এসব কথা ঠিক। কিন্তু যখন অবস্থা অনুকূল হবে তখন? তখন কী হবে এই দুর্ভাবনায় ক্লিষ্ট হয়ে শ্যাম প্রায়ই ভাবত, যুদ্ধ যখন একটা হচ্ছে তখন এই সুযোগে যুদ্ধ বিদ্যাটা শিখে নেওয়া উচিত।

তাছাড়া, যুদ্ধে যাওয়া মানেই বিদেশে যাওয়া। একবার দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়তো চীনে যাওয়ারও একটা রাস্তা মিলে যাবে। এও একটা কথা।

বহুদিন শ্যামের এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথে প্রধান বাধা ছিল পার্টির বারণ। '৪১ সালের শেষভাগে জাপান যখন তার দিগ্বিজয় শুরু করল, তখন অনুমতি পাওয়া গেল।

শ্যামের চরিত্রে রাজনীতির স্পর্শ ছিল, অতএব সদর দরজা দিয়ে সৈন্যদলে ঢোকা শক্ত হত। কিন্তু শ্যাম চৌধুরীবংশের ছেলে। অতএব একটু তদ্বিরেই নিচের দিককার পুলিসের আপত্তি উপর-ওয়ালাদের হস্তক্ষেপে চাপা পড়ে গেল।

আর দিনকালও ছিল যাকে খুলনের ভাষায় বলে 'বেকায়দার'। ব্রিটেনের দুখানা সেরা জাহাজ 'প্রিন্স অভ ওয়েলজ্' আর 'রীপাল্স্'—যে জাহাজ নাকি ডোবানো অসম্ভব, নামজাদা অভিজ্ঞ-দের মতে—সিঙাপুরে জাপানী বিমান অবলীলাক্রমে সেই দুখানা জাহাজ ডুবিয়ে দিলে। তার দরুণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যত ক্ষতি হল সিঙাপুরে, তার চার ডবল মর্যাদাহানি হল ডালহৌসী স্কোয়ারে। সরকারী দপ্তরে দপ্তরে কেরাণীরা গোল হয়ে খবরের কাগজের ম্যাপে ফুট ইঞ্চি মেপে হিসেব করতে লাগল শেষের আর কত বাকী। আজ গেল হংকং, কাল সিঙাপুর। থাইল্যান্ড ওল্টালো, যায় বুঝি বর্মা! কেরাণীরা উচ্চৈঃস্বরে বলাবলি করতে লাগল, 'শালারা পালাবে তো নির্ঘাত, এখন দেখ যাতে মাইনেটা চুকিয়ে দিয়ে পালায়, নইলে শ্যাল-কুকুরের মত না খেয়ে মরতে হবে—যদ্দিন জাপানীরা না আসে।"

অতএব, এমন অবস্থাতেও যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিতে

চায়, সামান্য চরিত্রদোষের জন্য তাদের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার পথে বাগড়া দেওয়া সরকার যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। শ্যাম ঢুকে গেল।

শ্যামের রণবেশ দেখে মেজদি হেসে আকুল। বললেন,

"তোদের ব্যারাকে আয়না নেই বুঝি? যা আমার ঘরে গিয়ে বড় আয়নায় দেখে আয় কী সঙ সেজেছিস্—একেবারে তাল-পাতার সেপাই। তোকে দেখলে—কাঠির মত দুখানা পায়ে জাহাজের মত দুখানা বুট—হাসতে হাসতে জাপানীদের পেটে খিল ধরে যাবে।"

মেজদির হাসিতে একটুও না দমে শ্যাম গট গট ক'রে ট্রেনিং ক্যাম্পে চলে গেল।

প্রথম দফা ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে শ্যাম তার অফিসারকে বললে, সে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চায়। অফিসারটি ছিল শ্যামের মনের মত মানুষ—যারা শিখতে চায় তাদের জী-জান দিয়ে শেখায়। শ্যামের আগ্রহ দেখে অফিসার তাকে শুধু রাইফ্‌ল চালানো, সঙ্গীন-যুদ্ধ, গ্রেনেড ছোঁড়া নয়, এমন অনেক বস্তু শিখিয়ে দিয়েছিল যেগুলো কেবল বাছা বাছা এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী সৈন্যদেরই শেখানো হয়—যেমন, বিনা-অস্ত্রে যুদ্ধ।

শ্যামের কথা শুনে অফিসার বললে,

"উঁ? যুদ্ধক্ষেত্র? আমার ইচ্ছে ছিল আরও একটা জিনিস তোমাকে শেখাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিই। সেটা না শিখেই যাবে?"

শ্যাম জিজ্ঞেস করল, সে জিনিস কী।

অফিসার বললে, "প্যারা-ট্রেনিং, উড়োজাহাজ থেকে প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়বার কলাকৌশল। জিনিসটা খুব চলছে আজকাল। প্রথমে ওটা চালু হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে। এখন জার্মানরাও ওটা ঘন ঘন ব্যবহার করছে। আমরাও আরম্ভ করেছি সম্প্রতি। তুমি রাজী আছ ও ট্রেনিং নিতে?"

শ্যাম বললে, "আছি।"

আরম্ভ হয়ে গেল শ্যামের প্যারাশুট ট্রেনিং। এর অফিসারটি ছিল ছিটগ্রস্ত। অবিশ্রান্ত বক্‌ত সে—তার কোন্‌টা কাজের কথা আর কোন্‌টা বাজে তা কেউ চট ক'রে বুঝতে পারত না। ট্রেনিংটা ছিল বেশ

একটু গোপন, কিন্তু অফিসারের গলাটি ছিল এমন বাজখাঁই যে সে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বললেও দশ গজ দূর থেকে তার কথা স্পষ্ট শোনা যেত।

''ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের গুরু—এখানে। বাইরে আমার নাম চার্লি। আপনাদের ট্রেনিং শুরু হল। ব্যাপারটা কিছুই নয়, খুবই সহজ, শুধু গুটিকতক জিনিস সড়গড় ক'রে নিতে হবে। আমি এই যুদ্ধে বাইশবার লাফিয়েছি—এই অধম চার্লি। তা হলেই বুঝছেন এ কাজে বুদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই।

''লোকে বলে আমার বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তাই আমি বেপরওয়া। বাজে কথা। আর বউএরই বা কী দোষ বলুন! যেদিন আমার বিয়ে হল, লাগল যুদ্ধ তার পরদিনই। লণ্ডনে যেদিন বোমা পড়ল, বোমা পড়লো তো পড়লো আমারই নীড়ে। যাবতীয় আসবাবপত্র, বউএর কাপড়, আমার বেসামরিক পোশাক, মায় আমাদের বিয়ের সার্টিফিকেট শুদ্ধ জ্বলে ভস্ম হয়ে গেল। বউ গিয়েছিল কারখানায় কাজ করতে তাই প্রাণে বেঁচে গেল। গেল সে আমার পিসীর বাড়ী, সাতদিনের মধ্যে সে-বাড়ীও উড়ে গেল। বলুন সে করে কী?

''যাক সে কথা। আমি বলছিলাম, বিষয়টি খুবই সহজ। একখানা খাসা পদ্য আমি আপনাদের শিখিয়ে দেব—তারই তালে তালে কাজ করবেন। লাফিয়ে পড়বার সময় পদ্য আওড়াতে শুরু করবেন, যেমনি প্রথম লাইনটি শেষ হবে, অমনি রামদড়িখানা টেনে দেবেন—সব কলকাঠি ওই দড়ির মধ্যে। এক লহমার মধ্যে প্যারাশুটটি খুলে গিয়ে আপনার মাথার উপর রাজছত্রের মত বিরাজ করবে—শীতাতপে কোনো কষ্ট হবে না। অবশ্য যদি প্যারাশুটটার তৈরীতে কোনো খুঁত থাকে তাহলে—

''তারপর একখানা গড়াগড়ি, মা ধরিত্রীর বুকে। এইটুকুই তো কথা, আবার কী?''

শ্যাম লাফাল, একবার, দুবার, তিনবার। তারীফ পেল, পিঠচাপ্ড়ানি খেল, কিন্তু মনে হল সত্যি প্রশংসা তার প্রাপ্য নয়। হাত-পা তার প্রতিবারেই কলের মত কাজ ক'রে গেল, কিন্তু বিষয়টি-

যে সহজ, এ অনুভূতি তার কোনোবারই হল না। একদিন সে খুলে বললে এ কথা তার অফিসারকে।

চার্লি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে,

"তাও কি হয়? মুখে বলি কথা, কিন্তু মন কি অত সহজে মানে? আমি বাইশবার লাফিয়েছি, বাইশটিবার আমার মনে হয়েছে 'এবারে আর নিস্তার নেই!' নিস্তার যে পেয়েছি তার কারণ আমার মন নয়, হাত-পা কলের মত কাজ ক'রে গেছে তাই বেঁচেছি। আমি দেখেছি লক্ষ্য ক'রে—তোমারও হাত-পা ভাবে না, যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যায়। তোমার কোনো ভয় নেই।"

প্রায়ই চার্লি শ্যামকে তার জীবনের কাহিনী শোনাতো। সাদাসিদে মানুষ চার্লি, তেত্রিশ বছরের বারো বছর কাটিয়েছে সৈনিক হয়ে, তার গল্পে কীই বা থাকবে? কখনো শোনাত সে তার এক পোষা কাঠবেরালীর গল্প, কখনো বলত তার ভ্রমণ কাহিনী, আর প্রায়ই দিত তার বাইশবারের প্যারাশুট লাফানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

হাঁ ক'রে শ্যাম শুনত। প্রত্যেকটি কথা তার মনে গেঁথে যেত।

একদিন চার্লি তাকে ডেকে বললে, "ওহে, তোমাকে একজন মেজর খুঁজছেন।"

শ্যাম গিয়ে দেখল অপরিচিত লোক, বোধ হয় ইংরেজ, কিন্তু চেহারায় কোথায় যেন একটু মোঙ্গোলীয় ছাপ। সৌম্যমূর্তি, দীর্ঘ সুপুষ্ট চেহারা। প্রথম দর্শনে মন্দ লাগল না লোকটিকে।

মেজরটি বললেন, "তোমার অফিসারেরা তোমার খুব সুখ্যাতি করেন।"

শ্যাম বললে, ধন্যবাদ।

মেজর বললেন, "কিন্তু পুলিস তোমার ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়।"

শ্যাম জিজ্ঞেস করলে, "মিলিটারী পুলিস?"

মেজর বললেন, "না, বেসামরিক পুলিস, তোমার থানার পুলিস।"

শ্যাম বললে, "ও!" সে আন্দাজ করল তার সামরিক জীবনের অবসানের আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

মেজর একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ একগাল হেসে তার পিঠ চাপড়ে বললেন,

"এই রকম লোকই আমরা খুঁজছি।"

শ্যাম অবাক হয়ে ভাবলে, বলে কী লোকটি?

মেজর বললেন, "এই আমার বাড়ীর ঠিকানা। আজ সন্ধ্যে-বেলায় সেখানে এস, কথাবার্তা হবে।"

মেজর বললেন, তিনি সম্প্রতি চুংকিং ঘুরে এসেছেন। চুংকিং গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল সামান্যই, আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মাও-সে-তুং-এর দলের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। চুংকিং গভর্ণমেণ্ট চায়নি বিদেশীদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ হোক, কিন্তু মেজর কাজ সেরে এসেছেন অতি গোপনে।

সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও শ্যাম উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না। অতিমানুষ তো সে নয়। মেজর বলতে লাগলেন,

"ওদের যুদ্ধকৌশল একেবারে আলাদা। ওরা শত্রুর সঙ্গে লড়ে চারপাশ থেকে। জাপানীরা এত যুদ্ধপটু, কিন্তু জু-দে'র সৈন্যদের ফাঁদ কিছুতেই এড়াতে পারে না। যেখানেই যায় জাপানীরা, দেখে জু-দে'র লোক চারপাশে!"

শ্যাম মনে মনে বলল, তোমাদের কাছে ও খবরটা নতুন, কিন্তু আমরা বহুদিন আগে ওসব আমাদের বই-এ পড়েছি। তোমাদের এখানে লড়ে শুধু মাইনে-করা সৈন্য, জনসাধারণ নির্লিপ্ত দর্শক-মাত্র। উত্তর-পশ্চিম চীনে সবাই জনসাধারণ, সবাই সৈন্য। কিন্তু, এসব তো গৌরচন্দ্রিকা, আসল বক্তব্যটা কী হুজুরের? এ কথা নিয়ে শ্যামের সঙ্গে আলোচনা কেন?

মেজর বললেন, "উ আউঙ সানের নাম শুনেছ?"

"না।"

"উ আউঙ সান বর্মার জাতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি। লোকে

জানে তিনি জাপানীদের দিকে। কিন্তু আমরা জানি তিনি কারো দিকে নন্। তিনি চান্ বর্মার স্বাধীনতা।''

শ্যাম ফস্ ক'রে ব'লে ফেলল, ''হয়তো ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মিও শুধু চায় ভারতের স্বাধীনতাই, অন্য কিছু নয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে রটে কেন যে তারা ভারতে জাপানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়?''

কথাটা ব'লেই শ্যামের অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল। ছি, ছি, হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় সে এ কী ক'রে ফেলল। বাবা হর্মিন্দর সিং এত বার বলেছিল তাকে—মুখটি বুজে কাজটি শিখে নিতে, মনের কথা কাউকে প্রকাশ না ক'রে। সব ভেস্তে গেল নিমেষের ভুলে।

কিন্তু কোনো বিপর্যয় ঘটল না। মেজর শান্তমুখে বললেন, ''আউঙ সানের খবরটা আমরা পাকাপাকি জানি তাই জোর গলায় বলতে পারি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মির খবর আমি জানি না। হয়তো তোমার কথা ঠিক।''

তারপর, আবার সকালবেলার মত একগাল হেসে শ্যামের বুকে মাঝারি ওজনের এক তর্জনীর ঠোকা মেরে মেজর বললেন,

''ইচ্ছে হয়, সঠিক খবরটা নাও না গিয়ে!''

অন্য ব্যক্তি হলে ভাব্তো মেজর একটা রসিকতা করলেন। কিন্তু শ্যামের মাথায় তখন ঘুরছে মাও-সে-তুং-এর গেরিলা সৈন্য-দলের কথা—যারা জাপানী বেড়াজালের মধ্য দিয়ে মাছের পোনার মত একবার ঢোকে আবার বেরোয়। তার দুকান ভর্তি চার্লির গল্প—বাইশবার লাফ, কখনো নরওয়েতে, কখনো ফ্রান্সে, জার্মানদের চোখ এড়িয়ে; আবার উধাও হওয়া, অন্ধকারে নৌকো বেয়ে, জলে-ভাসা উড়োজাহাজে, অথবা ডুবোজাহাজে। তার মনে হল মেজরের কথাটা ঠাট্টা নয়, সত্যি। হয়তো মাও-সে-তুং-এর কাছ থেকে উনি কোনো খবর এনেছেন যার বলে সত্যিই শ্যামকে নিরাপদে সিঙাপুরে হাজির করা যেতে পারে।

মেজর বললেন, ''আমি বর্মার লোক, বর্মী মনোভাব জানি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মির মনোভাব আমার চেয়ে তুমি ভালো

বুঝবে। তাই বলছিলাম, তুমি যদি চাও বর্মায় গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে, আমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি।"

এর উত্তরে বলবার কোনো কথা শ্যাম খুঁজে পেল না। তার উদ্দেশ্য চীনের সঙ্গে যোগাযোগ; আই· এন· এ·র কথা সে কখনো ভাবেনি। বিশেষতঃ এমন অভিনব উপায়ে যোগাযোগের কথা! তা-ছাড়া, ধরেই যদি নেওয়া যায় আই· এন· এ·র সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ তার হল, তারপর? সে কে যে তার কথা তারা শুন্‌বে বা গ্রাহ্য করবে?

এ আলোচনা থেকে পরিত্রাণ পাবার সবচেয়ে সহজ পন্থা হল মেজরকে বলা যে অমন দুঃসাহসের কাজ তার দ্বারা হয়ে উঠবে না। কিন্তু তাও বলা নিজের অপমান। শ্যাম স্থির করল কথা খোলা-খুলি ব'লে ফেলাই ভালো। সে বললে,

"তুমি জানো বোধ হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমার মোটেই বনিবনা নেই। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও নেই। আমি চাই আমার দেশের স্বাধীনতা। আমি যদি বর্মায় যাই যাব শুধু ঐ জন্যেই। ব্রিটিশ বা জাপানী কোনো সাম্রাজ্যের খাতিরেই আমি এক পাও বাড়াব না।"

মেজর বললেন, "আমি বললাম তো তোমাকে, আমি শুধু বর্মা বুঝি; ইণ্ডিয়ার আমি কিছু জানি না। আমি জানি তোমার দ্বারা বর্মার কোনো ক্ষতি হতে পারে না, তাই তোমাকে বর্মায় পাঠাতে আমার এতটুকুও ভয় নেই, তুমি সেখানে গিয়ে যাই করো। আর পারোও তুমি সেখানে যা খুশী তাই করতে, ব্রিটিশ রাজত্ব তো আর ওখানে নেই! কে তোমাকে আটকাবে? আমি শুধু একটি জিনিস চাই, ভারতীয়দের সঙ্গে যেন আউঙ সানের দলের কোনো সংঘর্ষ না হয়। জাপানী শাসনে বর্মীরা তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠেছে—দুহাত তুলে যারা জাপানীদের অভ্যর্থনা করেছিল তারাও। আউঙ সানের সৈন্য সুবিধে পেলেই জাপানীদের উৎখাত করবে। সে সময় যখন আসবে তখন যেন একটা বর্মী-ভারতীয় যুদ্ধ না বাধে জাপানী প্ররোচনায়। এইটুকুই আমি চাই।"

মেজরের কাছ থেকে শ্যাম সোজা গেল হর্ষের 'কমিউন' বা বিপ্লবী মেসে।

কমিউনে সবাই 'পেশাদারী বিপ্লবী'; কেউ সাত বছর জেল খেটেছে, কেউ চোদ্দ বছর আটক থেকেছে, কেউ বছরের পর বছর পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার থেকে সম্প্রতি আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছে। বাসিন্দেরা বিপ্লবী হলেও বাঙালী, অতএব অবিপ্লবী মেসেরই মত এখানেও আড্ডা জমে। তবে গুলতুনি হয় সাধারণতঃ রাজনীতি নিয়ে।

এমনি একটা আড্ডা বসেছিল হর্ষের কমিউনে। আলোচনা হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং গণযুদ্ধ নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা গণযুদ্ধ যে কখনও হতে পারে না এইটাই নানা বক্তা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাচ্ছিলেন। কিছুদিন আগে একফাঁকে কয়েক-জন বিপ্লবী বিমানবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল; সম্প্রতি পুলিসের আপত্তিতে তারা বরখাস্ত হয়েছে—এই ঘটনাটা আলোচনায় পুনঃ-পুনঃ ইন্ধন জোগাচ্ছিল, এবং সবাই সম্পূর্ণ একমত হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার উষ্মা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হল উর্দিপরিহিত শ্যাম। সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল। একটি গাইয়ে ছেলে বিখ্যাত একটি ঠুংরী বিকৃত ক'রে গেয়ে উঠল "আয়ে র—গশ্যাম"।

শ্যামের মনে হল তার সমস্যার এই সমাধান। একা বর্মায় গিয়ে সে কী করবে? অচেনা জায়গা, অজানা ভাষা, না সে কাউকে চেনে, না আছে তার ডেরা। হঠাৎ যদি এমন লোক ভুঁইফোঁড়ের মত আই· এন· এ· দপ্তরে গিয়ে উদয় হয় তবে কেউ তার সঙ্গে কথা বলা দূরস্থান তাকে তো ঢুকতেই দেবে না!

কিন্তু এরা—এই দলটা—যদি গিয়ে সেখানে গেড়ে বসে তবে হবে কাজ। ঐ নিকুঞ্জ, হর্ষ, সত্যেন—অসম্ভব পড়া সত্যেনের—ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, বিপ্লবী বিদ্যের একটি জাহাজ; ওকে নিয়ে যাওয়া মানে লেনিনের পুরো এক সেট বই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এরা সবাই যদি সঙ্গে থাকে তবেই পারবে শ্যাম কিছু ক'রে উঠতে, নচেৎ নয়। হর্ষের সঙ্গে বসে পরামর্শ করতে হবে।

খানিকক্ষণ আড্ডায় বসে শ্যাম হর্ষকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বিষয়টা গোপনে আলোচনা করতে।

হর্ষ আনুপূর্বিক শুনে বললে, "ঠিক বলেছিস্ তুই। আমরা পুরো এক দঙ্গল যাব। এখানে থেকে গণযুদ্ধের কাজ এগোবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লম্ফঝম্ফই সার; ওদের তোড়জোড় শেষ না হতেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ খতম হয়ে যাবে। ওদিকে গেলে হয়তো গেরিলাবাহিনীতে যোগ দেওয়া যাবে, হয়তো চীনের সঙ্গে যোগাযোগের একটা রাস্তাও খুলে যেতে পারে।"

উল্লসিত হয়ে শ্যাম গিয়ে মেজরকে কথা দিয়ে এল।

আবার আরম্ভ হল ট্রেনিং। অফিসারদের দস্তুরমতো তাক্ খাইয়ে দিল শ্যাম। ছ' হপ্তায় তার বর্মীভাষায় কথাবার্তা রপ্ত হয়ে গেল। বর্মার ম্যাপ, রেঙ্গুনের পথঘাট তার নখদর্পণে এসে গেল। জাপানীদের হালচাল, দুটো একটা বুলি এও সে শিখে নিল।

দঙ্গলের অন্য ছেলেদেরও ট্রেনিং হয়ে গেল। তাদের কে কোথায় যাবে, কেমন ক'রে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে তার বিস্তারিত প্ল্যান তৈরী হল। কিন্তু কী তাদের কার্যকলাপ হবে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই হল না। মেজর তার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলে,

"আমি বার্মান। বর্মার কোনো ক্ষতি তোমাদের দ্বারা হতে পারে না—কারণ তোমরা মনে-প্রাণে খাঁটি লোক, এবং ভারতীয়—এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বাকী তোমাদের হাত; প্ল্যান ক'রে কী হবে?"

অমাবস্যা। বোমারু উড়োজাহাজ চলেছে বর্মার পথে। সাতখানা জাহাজ, সারি বেঁধে চলেছে বকের পাঁতির মত। মেঘের উপর দিয়ে চলেছে, কনকনে ঠাণ্ডায়।

ছখানি জাহাজে শুধু বৈমানিক—চালক, নাবিক, কামানদাগ।

কেবল একখানি জাহাজে দুটি অতিরিক্ত যাত্রী, শ্যাম এবং মেজর। যুদ্ধের রসদের মধ্যে সে-জাহাজে আছে মাত্র দুটি হালকা বোমা।

নাবিক এসে মেজরকে খবর দিলে, সময় হয়েছে। আর পাঁচ মিনিট বাদেই তাদের জাহাজখানা সারি থেকে সরে গিয়ে প্রোম-রেঙ্গুন পথের উপর দিয়ে উড়ে যাবে। তার পরেই—

মেজর শ্যামকে বর্মী ভাষায় জিজ্ঞেস করলে,

"কিছু বলবে?"

শ্যাম বললে, "একটা কথা। এর আগে কাউকে এভাবে ফেলা হয়েছে?"

মেজর বললে, "হয়েছে ইউরোপে, চীনে। কিন্তু এ-অঞ্চলে তুমিই প্রথম।"

আর কোনো কথা বলবার সময় হল না।

শ্যাম এসে দাঁড়াল তার নির্দিষ্ট স্থানে। বোমা ফেলবার জানলা খুলে গেল। রক্তমাংসের দেহটা তার মুহূর্তে হয়ে গেল জড়ধাতুর। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তার দেহ ত্যাগ ক'রে গেল, তার স্থান নিল কতকগুলো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। এখন আস্‌বে কানে আদেশ,

"অ্যাক্‌শন স্টেশন—ওয়ান্‌—টু—"

পরক্ষণেই হতজ্যোতি উল্কাপিণ্ডের মত একটা জড়দেহ নিক্ষিপ্ত হবে শূন্যে। অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন, অসহায় সেই ক্ষুদ্র দেহটাকে বিরাট পৃথিবী সহস্র অদৃশ্য বাহু দিয়ে টেনে নেবে তার বুকে, ক্ষিপ্রবেগে, আরও ব্যগ্র আরও ক্ষিপ্রবেগে। মহাশূন্যের কোটি নক্ষত্রের উদ্‌ভ্রান্ত আকর্ষণ থেকে রক্ষা ক'রে মুগ্ধা পৃথিবী উন্মত্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে তার দেহটাকে—প্রাণহীন, অচেতন দেহটাকে। ভঙ্গুর প্রাণচৈতন্যে স্পন্দন বিশ্বের; অক্ষর দেহবস্তুতে অধিকার পৃথিবীর, একা পৃথিবীর।

কার দেহ শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল? যন্ত্রচালিতের মত কে প্রলাপের ছন্দে বাঁধা অর্থহীন একটা কবিতার অস্ফুট আবৃত্তি আরম্ভ করল? সে কবিতার প্রথম চরণ শেষ হতেই কার অচেতন হাত প্যারাশুটের একটা দড়ি ধরে টান্‌ল? শ্যাম জানে না।

প্যারাশ্যুট খুলতে লাগল। রাজছত্র? কোথায় রাজছত্র? ঘাতকের পরিচ্ছদে রাজছত্র? অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে প্যারাশ্যুটের কালোবরণের রূপ কেউ দেখ্‌ল না, শ্যামও নয়। কারণ, চৈতন্যস্বরূপ শ্যাম তখনও দো-মনা—ত্রিশঙ্কুর মত দাঁড়িয়ে—তার দোদুল্যমান জড়দেহ, আর অনন্তনির্বাণের ঠিক মধ্যপথে।

শ্যামের পড়ার বেগ ধীরে ধীরে কমতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চেতনাও ফিরে এল একটু একটু ক'রে। প্রথমে অতীতের স্মৃতি ফিরল —মেজদির কথা মনে হল, দু চোখ জলে ভরে উঠল। তারপর এল ভবিষ্যতের অনুভূতি।

অন্ধকার। অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অমাবস্যার এ রাতের চেয়ে, পায়ের নিচেকার পৃথিবীটার চেয়েও। কেন এল শ্যাম? নির্বোধ একটা আবেগে। এখন শেষ, সব শেষ। এই মুহূর্তে হয়তো একশো জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, শিকারী বেড়ালের মত, আর একটু নামলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। চোখধাঁধানো সার্চলাইটের আলো কবন্ধের হাতের নখের মত তার দেহটাকে বিঁধবে, শ্মশানে প্রেতাত্মার মত অট্ট হেসে উঠবে মেশীনগান—

হঠাৎ দূর থেকে বোমা ফাটার আওয়াজ শোনা গেল। শ্যাম বুঝল তাকে আড়াল দেবার জন্য বোমা পড়ল দূরে। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে জাপানী স্থলসেনার পাল্টা জবাব শোনবার জন্য। অনেক দূরে একটা মেশীনগানের আওয়াজ হল, একবার, তারপর সব চুপ।

এইবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাটি। একটা জঙ্গল, তারপর একটা ডোবা—ডোবা বাঁচিয়ে পড়তে হবে তাকে—একটু সমান জমিতে —ধানক্ষেতে নয়, দাগ পড়বে—চাই আ-চষা রুক্ষ জমি—

ধপ্‌ ক'রে শ্যাম মাটিতে লাফিয়ে পড়েই গড়াতে শুরু করল। আবার তার দেহযন্ত্র চালাবার ভার নিলে চার্লি,

"গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামবে একটা গর্তে—শুক্‌নো একখানা গর্তে। আশেপাশে ঝোপ থাকে তো খুবই ভালো। ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবে, আর ছড়া কাটবে মনে মনে। যদি দেখ সব চুপ, ঝপ ক'রে কাপড় বদলে নেবে—নিঃশব্দে, হৈ চৈ কোরো না। প্যারাশ্যুট, সরকারী উর্দি সব গর্তে পুঁতে ফেলবে, টুঁ শব্দ না ক'রে, ঝোপের

আড়ালে। তারপর অতি সন্তর্পণে চারিদিক একবার দেখে নিয়ে বাবুটি হয়ে হাওয়া খেতে বেরুবে।''

শ্যাম বেরোল বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়ের বেশে। খানিকক্ষণ খানা-খন্দ ডিঙিয়ে চলবার পর চষা জমি নজরে পড়ল। লোকালয় কাছেই,—সাবধান শ্যাম! আল বেয়ে চলল সে পথের খোঁজে।

গর্তে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তার খিদেটা চেগে উঠেছিল। পকেটে ছিল চকোলেট, একটু ভেঙে মুখে দিয়েছিল—দিয়েই থুথু ক'রে ফেলে দিতে হল। চিরকালের প্রিয় খাদ্য তার চকোলেট, এখন বিষের মত বিস্বাদ লাগল। অতীতের পোশাক পুঁতে ফেলবার সময় সে তার সঙ্গে-নেওয়া খাবারটুকুও পুঁতে ফেলে ভবিষ্যতের হাতে তার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের দায়িত্ব ছেড়ে দিল।

সে কে? সে শ্যাম নয়, করালী—করালীচরণ শিকদার। তার কাকা কালীচরণ—শ্যামাচরণ নয়, কালীচরণ—রেঙ্গুনে স্টীল ব্রাদার্সে কেরাণীর কাজ করত। তার বাবা মারা যাবার পর করালী বর্মায় তার কাকার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কাকা তাকে একটা পিওনের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন স্টীল ব্রাদার্সেরই একটা চালের আড়তে। রেঙ্গুনে বোমা পড়ল, করালী কাকার খবর নিতে এল, এসে শুনল কাকা নেই। তিনি নাকি ডকে ছিলেন বোমা ফাটবার সময়, আর ফেরেননি।

তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও করালী তার কাকার সন্ধান পেল না। তার এক বন্ধু রমেশ (হর্ষ এলে এই নামেই তার পুনর্জন্ম হবে) তাকে বললে, সবাই পালাচ্ছে তাদেরও পালানো উচিত। হয়তো তার কাকা জাহাজে ক'রে দেশে চলে গেছেন, নয় তিনি আর নেই; বৃথা তাঁকে আর খুঁজে লাভ নেই।

তখন তারা দুই বন্ধু রেঙ্গুন ছেড়ে প্রোম রোড ধরে বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ তারা একসঙ্গেই চলেছিল, কিন্তু থেগোনের কাছাকাছি একদিন জোর বোমা পড়ল, ভয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল, যখন জ্ঞান হল দেখল রমেশ কোথাও নেই, সে শুয়ে আছে এক হ্পঙ্গিচাউং অর্থাৎ বর্মী ভিক্ষুনিবাসে। ভিক্ষু তাকে খাইয়ে-

দাইয়ে সুস্থ ক'রে পাঠিয়ে দিল পাউংদের এক বর্মী ব্যবসায়ীর কাছে। করালীর শরীরের অবস্থা দেখে ভিক্ষু বুঝেছিল হাঁটাপথে দেশে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। শক্ত সমর্থ লোক তখন পথে মরছে বেরাল কুকুরের মত, অন্নাভাবে, জলাভাবে, রোগে, শ্রান্তিতে। শ্যাম যেন তার আশ্রয়দাতা ব্যবসায়ীর কাছেই থাকে কিছুদিন, তারপর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলে ফিরে যায় ইয়াঙুনে।

তাই শ্যাম এখন ফিরছে রেঙুনে। একটা চাকরী জোগাড় করা দরকার, যাহোক একটা কিছু, বেয়ারা খানসামা কুলীর কাজ। দুটি খাওয়া জুটলেই তার চলে যাবে।

দূরে রেললাইন দেখা যাচ্ছে। লোকজনের গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। সাবধানে পথ চলতে হবে, কুকুর না খেপিয়ে। পথ প্রোম রোড নয়, শহরতলীর কাঁচাপাকা পথ। দু-তিনজন লোক যাচ্ছে বোঁচকা মাথায়। স্টেশনে যাচ্ছে বোধ হয়—বিমানহানার দরুণ ট্রেন রাতেই চলাফেরা করে। হন্ হন্ ক'রে শ্যাম এগিয়ে গেল তাদের দিকে। তাদের সঙ্গ ধরে সে জিজ্ঞাসা করল,

"খাম্ইয়ারো বেগো-থ্ওয়ানিরে—এ ? কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?" বর্মায় বর্মীভাষায় এই তার প্রথম পরীক্ষা!

লোকদুটি চলতে চলতে তার কথার জবাব দিল।

ব্যস, করালী! চুপ ক'রে যাও। হর্মিন্দরের কথা মনে আছে তো? অপর লোককে প্রথম কথা কইবার সুযোগ দিও না, তাহলে কথা গোড়া থেকেই বেয়াড়া চালে চলবে। প্রথম প্রশ্ন যেন তোমার তরফ থেকেই হয়। তারপর ভোম্ মেরে যাও, যেচে কথা কোয়ো না—শুধু চোখকান খুলে অন্যদের নজরে রাখো।

ওঃ, কী ওস্তাদ বাবা হর্মিন্দর। তারীফ করি গদরের। শ্যাম ভেবেছিল সে চলেছে লে'পাডান থেকে থারাওয়াডির দিকে, রেঙুনের পথে। লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে সে বুঝল সে ধরেছে ঠিক উল্টো পথ।

সে-যাত্রা শ্যাম বেঁচে গেল।

পৌঁছল শ্যাম রেঙুনে। এক বিড়িওয়ালার সঙ্গে তার

দোস্তী হয়ে গেল। বিড়িওয়ালা তাকে বিড়িবাঁধার কাজ শিখিয়ে দিয়ে তার দোকানেই তার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিল। শ্যাম হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

নানা রকমের লোক আসত বিড়িওয়ালার দোকানে, তামিল মজুর, জেরাবাদী, হিন্দুস্থানী। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে ব'লে শ্যামের জ্ঞান চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে লাগল। হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই সে রেঙ্গুনের বাসিন্দে বনে গেল। পরের অমাবস্যায় নিকুঞ্জ, শ্রীপতি, হর্ষ—তিনজনকে তিন জায়গায় নামিয়ে দেবার কথা। একে একে তারা সব রেঙ্গুনে আসবে। কোথায় কখন তাদের কার সঙ্গে শ্যামের দেখা হবে তা ঠিক করাই ছিল, কিন্তু কারো সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হল না। পর পর তিন অমাবস্যা, তিনটে মাস কেটে গেল, কেউ এল না। শ্যাম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

নিজের জন্য তার বিশেষ চিন্তা ছিল না। রেঙ্গুন তার দিব্বি সড়গড় হয়ে গেছে। বর্মী ভাষা সে রেঙ্গুনের পুরোনো ভারতীয় বাসিন্দেদের চেয়ে নেহাৎ খারাপ বলে না। জাপানী বুকনি, তাদের সেপাইদের সেলাম করার কায়দা এসবও আস্তে আস্তে এসে যাচ্ছে। কিন্তু কাজ? আসল কাজ? শুধু বিড়ি বাঁধতেই তো সে আর রেঙ্গুনে আসেনি!

চীনাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় অসম্ভব। এক তো জাপানী বর্মী উভয়েই চীনাদের উপর খাপ্পা। তারপরে যেসব চীনাদের পথেঘাটে দেখতে পাওয়া যায় তারাও অতি নিকৃষ্ট মাল—চণ্ডুখোর, বদমাইস। জাপানীদের সঙ্গে চোরাগোপ্তা কোনো কারবারও বোধ হয় তাদের আছে, নইলে তাদের জাপানী সামরিক পুলিস আটক ক'রে রাখত। কিছু কিছু চীনারা একদম বর্মী হয়ে গেছে, চীনা ভাষাই প্রায় ভুলে গেছে।

তারপর আই. এন. এ.। সেখানে ঘেঁষতে গিয়ে তো শ্যাম একেবারে সাক্ষাৎ শমনের মুখে পড়েছিল।

অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে শ্যাম কখনও চারদিক একবার না দেখে নিয়ে অজানা কোনো জায়গায় ঢুকত না। আই· এন· এ· আপিসে ঢোকবার আগেও সে একবার চারপাশটা দেখে নিচ্ছিল,

হঠাৎ নজরে পড়ল একটি ভারতীয়ের মুখ। একটা বাড়ীর জানলা থেকে অলক্ষিতে লোকটি চেয়ে আছে আই. এন. এ. আপিসের গেটের দিকে। শ্যামের মনে হল লোকটার কাজ গোয়েন্দাগিরি।

ব্যাপার কী? আই. এন. এ.র ওপর নজর! কাদের? জাপানীদের, না ব্রিটিশের? শ্যামের বড় কৌতূহল হল। সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বাড়ীটা চোখে চোখে রাখতে লাগল।

সন্ধ্যে আর একটু ঘনিয়ে আসতেই লোকটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। আই· এন· এ· আপিসের গেট সাবধানে এড়িয়ে লোকটা চট ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেল। শ্যাম আর কালবিলম্ব না ক'রে তার অনুসরণ করল।

লোকটার চলন দেখে শ্যামের মনে হল সে কোথায় তাকে দেখেছে—রেঙ্গুনে নয়, বর্মায় নয়, বোধ হয় দেশে।

লোকটা ঢুকল কেমপেই আপিসে। 'কেম্‌পেই' জাপানী সৈন্যবাহিনীর পুলিস, যাদের নেকনজরকে ভয় পায় না এমন লোক জাপানী সাম্রাজ্যে বিরল। তাহলে কি কেম্‌পেই আই. এন. এ.কে নজরে রাখে? কেন? ব্রিটিশদের সঙ্গে তো আই. এন. এ.-র যোগসাজসের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবে? তবে কি জাপানীদের ভয় বর্মী জাতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে আই. এন. এ.র যোগাযোগকে?

এই সমস্যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলতে চলতে শ্যাম হঠাৎ দেখল সেই লোকটা তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এবারে আর সন্দেহ রইল না লোকটা কে! কলকাতায় তার বাড়ী, শ্যামেদেরই পাড়ায়। অতিশয় দুশ্চরিত্র লোক, কোকেনখোর, নাম পরিতোষ। টাকার বিনিময়ে সে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিত এমনি একটা খ্যাতি তার বরাবরই ছিল, তাই শ্যামেরা কখনও ওর সঙ্গে মিশত না। লোকটা বছর দুতিন আগে তহবিল তছরুপ গোছের কী একটা ক'রে হঠাৎ কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়, কোথায় কেউ জানতে পারেনি। এখন বোঝা গেল এই জ্যান্ত গোখরোটি কোথায় এসে বাসা করেছে।

ত্বরিৎগতিতে শ্যাম অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

শ্যামের গুণে বিড়িওয়ালার দোকানটায় একটা পাঠচক্র গড়ে

উঠল। সবাই যে-কথাগুলো এলোমেলোভাবে বুঝত এবং বলত, শ্যাম সেগুলো ঝেড়েমুছে গুছিয়ে দিত। জ্বালাময়ী বক্তৃতার সম্মোহনে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা শ্যামের ছিল না। তার অস্ত্র ছিল দুটি, অকপট আন্তরিকতা এবং স্পষ্ট ধারণা। কমিউনের আড্ডায় শ্যাম প্রায়ই চুপ ক'রে বসে শুনত; কিন্তু আবছায়া-আবছায়া কথা শুরু হলেই শ্যামের মুখ থেকে অনর্গল প্রশ্ন বেরোতো— 'কেন ?' 'তার মানে ?' 'কী ক'রে ?' বিষয়টা দিনের আলোর মত স্পষ্ট না হয়ে ওঠা পর্যন্ত শ্যামের জিজ্ঞাসার বিরাম হত না।

হর্ষ-নিকুঞ্জের জন্য নিয়মিত নির্দিষ্ট স্থানে সে গিয়ে হাজির হত। কিন্তু তারা যে এসে পৌঁছবে এ ভরসা তার ক্রমেই কমে আসতে লাগল। সে স্থির করল, এই বিড়িওয়ালার চক্রটাকেই কেন্দ্র ক'রে সে "কাজ" চালাবে। তারপর সুযোগমত অন্য অন্য দলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা যাবে।

নানা দিক থেকে খবর এসে জড়ো হত দোকানে। একজন বর্মী ভদ্রলোক লুকিয়ে লুকিয়ে রেডিওতে খবর শুনতেন, তিনি এসে সেগুলো সঙ্গোপনে শ্যামকে শোনাতেন। একটি রেলমজুর লুকিয়ে উড়োজাহাজে ছড়ানো ইস্তাহার কুড়োতো—জাপানীদের কড়া হুকুম অমান্য ক'রে। সেগুলোর মর্মও সে শ্যামকে শোনাতো। আরও টুকরো টুকরো ছোট ছেঁড়া খবর আসত নানা দিক থেকে, নানান্ জনের মুখে।

খবরগুলোর কতখানি খাঁটি আর কতটা নিছক প্রপাগ্যাণ্ডা তা শ্যাম বুঝিয়ে দিত সওয়াল জবাবের দ্বারা। আর থেকে থেকে বলত,

"বর্মা জাপানীদের নয়, ব্রিটিশদেরও নয়। বর্মার লোককে তৈরী হতে হবে যাতে বর্মা আসে বর্মাবাসীদের হাতে। আমি এই বুঝি।"

বিশেষ ক'রে সে তৈরী করতে লাগল রেলমজুরটিকে—যাতে শ্যামের অবর্তমানেও সে চক্রটাকে চালাতে পারে।

একদিন অঘটন ঘটে গেল। বিড়ির দোকানে অকস্মাৎ পরিতোষ

এসে উদয় হল। বিড়িওয়ালা অনুপস্থিত ছিল, শ্যামই দোকানের খবরদারী করছিল, অতএব পরিতোষের দৃষ্টি এড়ানো গেল না।

কটমট ক'রে তার দিকে চেয়ে পরিতোষ বললে, পরিষ্কার বাংলায়,

''তোমার বাড়ি কলকাতায় নয়?''

শ্যাম ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার দিকে চেয়ে বললে, ''আইগ্যা না। আমগো দ্যাশ মৈমনসিং জেলায়।''

পরিতোষ বললে, ''তোমার দ্যাশ কোথায় জিজ্ঞেস করিনি। কলকাতায় কোথায় থাকতে তাই বলো।''

শ্যাম বললে, ''আইগ্যা কৈলকাতায় বাসা আছিল নাইরকলডাঙ্গায়।''

পরিতোষ বললে, ''উঁহু। নারকোলডাঙ্গায় তো আমার গতায়াত ছিল না। তোমাকে দেখেছি আমি লেকপাড়ায়। এস আমার সঙ্গে।''

তিন মাস কাটল শ্যামের কেম্‌পেই জেলে। তিন মাস ধরে চলল নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার—দৈহিক, মানসিক। আর অবিশ্রান্ত জেরা।

কতবার কতরকম ক'রে তাকে জানানো হল সে ব্রিটিশ গুপ্তচর। একবার বলা হলো তাকে ডুবোজাহাজে ক'রে টেনাসেরিম উপকূলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একবার বললে উড়োজাহাজ থেকে ফেলা হয়েছে তাকে বাসেইন অঞ্চলে। আর একজন বললে সে এসেছে স্থলপথে, আরাকান দিয়ে, তামু দিয়ে। শ্যাম শতদুঃখেও হাসল। সে বুঝল বহুলোক আসছে, নানা পথে। হয়তো হর্ষ, নিকুঞ্জ এরাও তারই মত আড্ডা গেড়েছে মেইক্‌টিলায়, কাথায়, বা মোনিওয়াতে, কিংবা হয়তো রেঙ্গুনেরই কাছাকাছি কোথাও।

থেকে থেকে পরিতোষেরও আবির্ভাব হত। কখনো সে গর্জাত, কখনও উপদেশ দিত। শেষে সে দস্তুরমত অনুনয় বিনয়

শুরু ক'রে দিল। বললে, অনর্থক একজন বাঙালীর মুণ্ডু কাটা যায় তা সে চায় না। জাপানীরা শ্যামকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। তার একটা ভালো চাকরীরও বন্দোবস্ত পরিতোষ ক'রে দিয়েছে—শুধু একটি শর্তে—বলুক শ্যাম, ব্রিটিশরা তাকে কোথায় ছেড়ে দিয়েছে। ব্যস ঐটুকু!

করালী শুধু হাউ হাউ ক'রে কাঁদে আর পরিতোষের পা জড়িয়ে ধরে। বলে,

"আমারে মাইর‍্যা ফালাইলো—আপনে ক'ন্ আমারে ছাইর‍্যা দিতে।"

একদিন তার ডাক পড়ল এক অফিসারের ঘরে। কাঁদতে কাঁদতে শ্যাম সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়ল।

অফিসার আধা-বর্মী আধা-জাপানীতে শ্যামকে বললে,

"তোমাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। সম্রাটের সেনাদলের সামরিক পুলিস বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দেয় না। তিন মাস শুধু সন্দেহের উপর ভর ক'রে তোমাকে আটক ক'রে রেখেছি, তারজন্য তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

করালী ভুলুণ্ঠিত হয়ে সম্রাটের শতবর্ষ আয়ু কামনা করতে করতে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। শ্যাম ভাবল, এ একটা নতুন ফন্দী।

কিন্তু সত্যিই শ্যামকে ছেড়ে দেওয়া হল।

রেলমজুর শ্যামকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। জেনারেল উ আউঙ্ সানের সৈন্যদলের সঙ্গে সংযোগ রাখার একটা পাকা বন্দোবস্ত তৈরী হয়েছে। ক'টা দিন কাটলেই সে শ্যামের সঙ্গে একজন বর্মী অফিসারের আলাপ করিয়ে দেবে।

বিড়িওয়ালার দোকানের মত আরও তিনটে চক্র হয়েছে, আরও হবে। রেলমজুরদের একটা গোপন ইউনিয়ন হয়েছে—বাছা বাছা লোককে নিয়ে।

জোর গুজব, জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাবে। শীগ্গিরই কিছু একটা কাণ্ড ঘটবে।

কাণ্ডটা ঘটল অপ্রত্যাশিত রকম তাড়াতাড়ি। জেনারেল আউঙ সানের সেনাদলের সঙ্গে জাপানী সৈন্যের বিরোধ আর চেপে রাখা গেল না; নানা জায়গায় খোলাখুলি ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। গেরিলারা সুযোগ বুঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বোমারু বিমানের হানা বড্ড ঘন ঘন হতে লাগল।

জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে চলে গেল।

শ্যাম দেশে ফিরল।

নিকুঞ্জ একটা দল নিয়ে আরাকানে গিয়েছিল, সে আগেই ফিরেছিল। মাসখানেক বাদে হর্ষও ফিরল। তারও কিছু কম নিগ্রহ হয়নি—পরিতোষেরই মত একটা ওঁচা আধা-ইংরেজ আধা-বর্মী গোয়েন্দার কবলে পড়ে তারও কেম্‌পেই-এর হাতে লাঞ্ছনা হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু প্রমাণ অথবা স্বীকারোক্তির অভাবে হর্ষেরও গর্দান বেঁচে গেল।

কলকাতায় কয়েকদিন খুব হৈ-হল্লা হল। জ্যাঠামশায় বললেন সোজা হাসপাতালে যেতে। মেজদি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। কমিউনে 'আয়ে রণশ্যাম' গাওয়া হল।

ইয়াসিন, বংশীধর, বিসম্ভর দেখা করতে এল। তার অভিজ্ঞতার গল্প বারবার বলতে হল।

কিন্তু ইতিহাস বারবার এক গল্প শুনতে চায় না। সে চায় নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাস্রোত, নিত্যনূতন কাহিনী। যুদ্ধের পর আসে শান্তি, শান্তির পর অশান্তি, আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব। আবার লাগে দেশে দেশে আলোড়ন। আসে প্রতিক্রিয়া, প্রভুত্বের মর্যাদায় দাসের উপর হিংস্র নিপীড়ন, আসে প্রতিবাদ, ভাঙে দাসের শৃঙ্খল। আসে ঢেউএর পর ঢেউ, ভেসে যায়, ডুবে যায়, চাপা পড়ে যায় পুরোণো গল্প।

ক্রমে ক্রমে শ্যামের বর্মী রূপ ঝরে গিয়ে তার সাবেকী চেহারা ফিরে আসতে লাগল। অনভ্যাসে আঙুলগুলো একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, দিনকতক রেয়াজ করতেই টাইপরাইটিং আবার রপ্ত হয়ে গেল। এদিক ওদিক থেকে টাকার তাগাদা আসতে লাগল। তারপর একদিন জোর তলব এল চটকল এলাকা থেকে। নতুন একটি কমরেড ট্রেড ইউনিয়নের হিসেব একদম গুলিয়ে দিয়ে বসে আছে, শ্যাম যেন অবিলম্বে আপিসে হাজির হয়ে হিসাব পরীক্ষা ক'রে গলদটা শুধরে দেয়, কারণ রীটার্ন সাবমিট করতে আর মাত্র দুদিন বাকী আছে।

কাপড়ভর্তি শান-ব্যাগ কাঁধে ক'রে শ্যাম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল।

মেজদি বলল, "আবার কোথায় দিগ্বিজয়ে যাচ্ছ শ্যামবাবু?"

শ্যাম বললে, "জগদ্দল।"